তাঁহার কোন অসম্পূর্ণ বাসনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন?" শিষ্যগণ বলিলেন, "হায়, এখন আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, ব্যাস ও পরাশর প্রভৃতি মহামুনিগণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বার্দ্ধক্য এবং শারীরিক রুগ্নতাবশতঃ তিনি ব্যাসদেববিরচিত ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য লিখিয়া যাইতে পারিলেন না।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, "যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, যদি তিনি আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির উপর সত্য সত্যই কৃপাপরবশ হইয়া থাকেন, এবং যদি ভগবান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, আমি সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই তাঁহার জীবনের শেষ বাসনা পূর্ণ করিব। যদি আমার এই সেবায় তাঁহার সম্মতি থাকে তবে তাহার নিদর্শনস্বরূপ বদ্ধ অঙ্গুলীত্রয় মুক্ত হউক।" এই কথা বলিবামাত্র শবদেহের বদ্ধ অঙ্গুলী খুলিয়া গেল। এবম্বিধ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। রামানুজ যে যমুনাচার্য্যের স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন যমুনাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বররঙ্গ রামানুজের সম্মুখে গমন করিয়া বলিলেন—"প্রভো, আপনিই আমাদের গুরুদেবের প্রিয়তম ভক্ত, আপনার উপরেই তাঁহার দৈবশক্তি নিপতিত হইয়াছে।" তৎপরে তিনি অন্যান্য শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বন্ধুগণ! এই মহাপুরুষই আমাদের ভবিষ্যৎ গুরু। ইহাঁকে দেখিবার জন্যই আমাদের গুরুদেব বাসনা করিয়াছিলেন; কারণ স্বহস্তে ইহাঁকে তাঁহার স্থানাভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অতএব ইনিই এক্ষণে আমাদের গুরু—ইহাঁরই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইব।" এই কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তাহাই হউক"। তৎপরে রামানুজ বলিলেন "আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে তিনি অতি গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবান আমাকে সেই গুরুভার বহন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিবেন। তিনি গুরুদেবের চির-বাঞ্ছিত ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সহায় হইবেন।" তদনন্তর যমুনাচার্য্যের শবদেহ সমাধিস্থ করিয়া সকলে মঠাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে কাঞ্চীনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রামানুজ সবিশেষ ঘটনা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিবৃত করিলেন। নম্বী যমুনাচার্য্যের তীরোভাব সংবাদ পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, রামানুজ তাঁহা অপেক্ষাও শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি রামানুজকে বলিলেন—"আর বিলাপ করিলে কি হইবে? কাঞ্চীশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

রামানুজ নম্বীর সান্ত্বনা বাক্যে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ বরদরাজের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নম্বীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নম্বীও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। এই নিকটতর সম্বন্ধে রামানুজ নম্বীর মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দেখিয়া তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে নম্বী নীচ কুলোদ্ভূত হইলেও স্বয়ং ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

একদিন রামানুজ নম্বীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "হে মহাভাগ, হে দেব, যদি দয়া করিয়া আমাকে আপনার পদতলে বসিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে অনুমতি করেন তবে এদাস চির কৃতার্থ হয়।" নম্বী এবম্বিধ প্রকারে সম্মানিত হইয়া বলিলেন "বৎস, অমন কথা বলিও না। তোমার গুরুপদ লাভ করিবার শক্তি আমাতে সম্ভবে না। বোধ হয় বরদরাজদেবের আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়া তুমি এইরূপ অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।" রামানুজ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, সকল জাতির মধ্যেই মহৎ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহাদের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা অতি সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করা উচিত। নম্বী বলিলেন—"না না, আমি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? ঋষিগণের এই জাতি সম্বন্ধীয় প্রথা প্রচলন করিবার কি কিছু উদ্দেশ্য নাই? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপই আচরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥'

হে পার্থ! দেখ, আমার কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করার প্রয়োজনই নাই, কারণ এই ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই এবং প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি।

'যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥'

কারণ, আমি যদি অতন্দ্রিত ভাবে কদাপি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, হে পার্থ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ করিবে।

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥'

সুতরাং আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে কর্ম্মহীন হইয়া সমস্ত লোক নষ্ট হইবে। বিহিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের বর্জ্জনাভাবে সংসারে ধর্ম্মসঙ্কর, আশ্রমসঙ্কর ও বর্ণ-সঙ্করাদি হইবে; সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে; সুতরাং তাহার কারণও আমি হইলাম; এই নিমিত্ত আমিই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥'

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের বিভাগ দ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া-বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই বুঝিবে; কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

অতএব হে মহাভাগ! তুমি মহাজন-সমাদৃত এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমাজবিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিও না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥'

যদিও স্বধর্ম্ম পরধর্ম্মের তুলনায় অপ্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণজনক, কিন্তু পরধর্ম্মকে ভয়াবহ বলিয়া জানিবে।

সুতরাং হে রামানুজ! ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া আমার ন্যায় নীচ জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করা তোমার কদাপি উচিত নহে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগিণী মেঘমিশ্র—তাল ঠুংরি।

জীবন-আঁধারে মোর কে তুমি সহায় আছ—এস।
চারিদিকে ঘনঘোর, অন্ধ এ পান্থ, কে তুমি সহায় আছ—এস।
বিজলী ঝিলিক হানে আকাশে, হুঙ্কারি ফেরে বনে বাতাসে,
সকল পরাণ কাঁপে তরাসে—কে তুমি সহায় আছ, এস।
এ দুখরাতে তোমা ডাকি, অন্ধের কে গো তুমি আঁখি!
দেখা দাও নিরাশ্রয় জনে দেখা দাও আশাহত মনে
বেদনা-মথিত জীবনে অমৃত-নিঝর কে গো—এস!

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ • ১´ •
II মা মা রা রা। সা সা সা -া I প্া সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I
জী ব ন আঁ ধা রে মো র্ কে তু মি স হা০ য় আ ছ

১´ • ॥ ১´ •
I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া I মা মা মা পা। পা পা পা -া I
এ০ ০০ ০ ০ স ০ ০ ০ চা রি দি কে ঘ ন ঘো র্

১´ • ১´ •
I ণা -া ণা মা। পা -া পা -া I সা সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I
অ ন্ ধ এ পা ন্ থ ০ কে তু মি স হা০ য় আ ছ

১´ •
I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া II
এ০ ০০ ০ ০ স ০ ০ ০

১´ ˙ ১´ ˙
[না না না]
II { মা পা পনা না। না -া না নর্সা I র্সা র্সা র্সা -া। -া -া -া -া I
বি জ লী॰ ঝি লি কৃ হা নে॰ আ কা শে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
[-া -া -া -া]
I র্সা -া ণা ধা। পা মা মা পা। পা র্রা র্রা -া। র্মজ্ঞা -া -া -া } I
হু ঙ্ কা রি ফে রে ব নে বা তা সে ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
I না না না না। র্সা -া র্সা র্রা I র্সা ণা ধা -া। -পা -া -া -া I
স ক ল প রা ণ কাঁ পে ত রা সে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
I সা সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া II
কে তু মি স হা॰ য় আ ছ এ॰ ॰॰ ॰ ॰ স ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
II { ন্া ন্া ন্া ন্া। ন্া -া ন্া সা I ধ্ন্া -সরা ন্সা -া। -া -া -া -া I
এ ছ খ রা তে ॰ তো মা ডা॰ ॰॰ কি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ১´ ˙
[-া -া -া -া]
I প্া সা সা -া। সা সা সা রা I ন্সা -রা রা -া। -মজ্ঞা -া -া -া } II
অ নু ধে রু কে গো তু মি আঁ॰ ॰ খি ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
II { মা পা পা -া। পা পা ণা ণা I মা -পা পা -া। -া -া -া -ান I
দে খা দা ও নি রা শ্র য় জ ॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
I না না না -া। না না না র্সা I -র্সা র্সা -া। -া -া -া -া } I
দে খা দা ও আ শা হ ত ম ॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
I পা র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা -র্রা I নর্সা -র্রা র্রা -া। -া -া -া -া I
বে দ না ম থি ত জী ॰ ব॰ ॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ˙ ১´ ˙
I সা সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া II II
অ মৃ ত নি ঝ॰ রু কে গো এ॰ ॰॰ ॰ ॰ স ॰ ॰ ॰

বাঁশী বাজান কি ভাল?

(শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়)

সাধারণতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন, "ওরে বাঁশী বাজাস্ নে, বুকের অসুখ হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে" ইত্যাদি। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা বিবেচ্য। শুধু বাঁশী বাজাইয়াই মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া লোক মারা গিয়াছে, এমন কোন সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা সর্ব্বদা বাঁশী বাজাইতে চাহেন তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাঁশী না বাজাইলেও ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি বা যাঁহারা অধিক পরিমাণে মদ গাঁজা প্রভৃতিতে আসক্ত তাঁহাদেরই বুক বা যকৃৎ (লিভার) হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে। বংশীবাদকগণের মধ্যে যদি কাহারও ঐ সকল দোষ থাকে এবং সেজন্য যদি তাহার অসুখ হয় তজ্জন্য বাঁশী বাজানই যে রোগের কারণ তাহা বলা উচিত নহে। যদি তাহা হইত তবে শ্রীকৃষ্ণের সময়কার কথা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক যুগের শ্রীচৈতন্য দেবের নগরসঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা রামশিঙ্গা বাজাইতেন অথবা নিরীহ পল্লীবাসী বা কৃষকগণের মধ্যে যাহারা বাঁশী বাজাইয়া থাকে, তাহাদেরও বুকের রোগ হইত বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিত।

জগতের যাহা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সমস্তই শ্রীভগবানে বিরাজিত। বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াও ভগবান বাঁশীর মোহ ভুলিতে পারেন নাই। যদি বাঁশী বাজান খারাপই হইবে তবে বিষ্ণু শঙ্খ, মহাদেব শিঙ্গা, কৃষ্ণ বেণু ও বলরাম রামশিঙ্গা বাজাইবেন কেন? যুদ্ধ বা শুভকার্য্যে শঙ্খধ্বনির প্রচলন কেন ছিল? হিন্দুর ঘরে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পূজায় ও শুভকার্য্যে শঙ্খ বাজিয়া তীব্র গম্ভীর স্বরে আনন্দ-সংবাদ প্রচার করিতেছে। যে জিনিষটি ভালর পরিচায়ক তাহা হইতে কখনও মন্দ হইতে পারে না।

সঙ্গীত যোগের একটি অঙ্গ। যোগসাধনায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ প্রয়োজন এবং সে কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধিও তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত করিতে হয়। যে সকল প্রক্রিয়ায় এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা অনেকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সেজন্য মহাযোগী মহাদেব সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শব্দ ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, প্রথমে প্রণবধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়। যাঁহারা একালে নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণমুখে (ওঁ) ওঙ্কার উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন অ-উ-ম এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া যে ভাবে ওঁ উচ্চারিত হয়, ঐ ছন্দে যে কোনও বাদ্যযন্ত্রে 'সা—মা' বাজাইলে সেইরূপ শব্দ হয়। সা হইতে মা ইহার মধ্যে সা, রে, গা, মা এই চারিটি সুর আছে। পঞ্চাননের চারিটি মুখ হইতে যথাক্রমে অ-উ-ম (সা, রে, গা, মা) ধ্বনিত হইয়া পঞ্চম মুখ হইতে পূর্ণস্বরে (ওঁ) ওঙ্কারের গুরুগম্ভীর সুর বাহির হয়। এই কারণেই বোধহয় ধ্যানে মহাদেবের পঞ্চমুখ বর্ণিত হইয়া থাকিবে। সামগানেও ঐ চারিটি সুর মাত্র (সা, রে, গা, মা) ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য বা 'গেঁয়' গানের সুর একঘেয়ে হইলেও তাহাতে সাধারণতঃ ৩, ৪ বা ৫টি সুর ব্যবহৃত হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। সে কারণ মনে হয় প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ঐ চারিটি সুরই সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দেশ-কাল-পাত্রভেদে আবশ্যকানুযায়ী অপর সুরগুলি এবং নানা রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধনা ব্যতীত সঠিকভাবে ওঙ্কার (ওঁ) উচ্চারিত হয় না। ওঙ্কার ধ্বনিত করিতে সা (-রে, গা-) মা উচ্চারণ করিতে হয়। সা, রে, গা, মা সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ, সুতরাং সঙ্গীতও যোগের অঙ্গ। এখন বাঁশীর সহিত যোগের সম্পর্ক কি, তাহাই আলোচ্য। যোগীরা কাপড় বা কলার মাঝ (কলা গাছের ভিতরকার অত্যন্ত নরম কচি সাদা পাতা) গলার ভিতর ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লইয়া "ধৌতি" করিতেন। বাঁশী, শঙ্খ বা শিঙ্গা বাজাইলে সেই কার্য্যই হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে "ধৌতি" সহজসাধ্য নহে তাঁহাদের জন্যই বাঁশী প্রভৃতির সৃষ্টি। "ধৌতির" উদ্দেশ্য, যোগের সুবিধা জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা। বাঁশী বাজাইয়াও সেই কাজ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে আজ অনেক দিনের কথা—আমার কোনও এক বন্ধু একজন উচ্চশ্রেণীর বংশীবাদক। তিনি প্রত্যহ দিনেরাতে ১০, ১২ ঘণ্টা করিয়া বাঁশী বাজাইতেন। এই ভাবেই বাল্যজীবন হইতে যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া হঠাৎ একদিন অসুখে পড়েন। বুকের বা গলার রোগ নহে, বিষমজ্বরে প্রায় ৮।৯ মাস কাল ভুগিয়া সুস্থ হইলে শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া বাঁশী বাজাইতে চিকিৎসক নিষেধ করেন। বাঁশী বাজানই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা ছিল। রোগ-শয্যায় ৮।৯ মাস পড়িয়া থাকায় সঞ্চিত অর্থ সমস্তই খরচ হইয়াছিল, উপরন্তু তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বাঁশী না বাজাইলে কিরূপেই বা তাঁহার সংসার চলিবে এই ভাবনায় তিনি কাতর হইলেন। যাহা হউক তাঁহার মনিব দয়া করিয়া তাঁহাকে বাঁশীর পরিবর্ত্তে হারমনিয়ম বাজাইবার অনুমতি দিলেন। তিনি হারমনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহারই আট মাস পরে তাঁহার হাঁপানি রোগ জন্মিল। অনেক অর্থব্যয় করিয়া যথারীতি

চিকিৎসায় কোনও সুফল হইল না। তাঁহাকে কষ্টগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহারই এক বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, "তুমি বাঁশী বাজান বন্ধ করাতেই এই রোগ হয়েছে।"

সেই সময় সেথানে তাঁহার চিকিৎসকও উপস্থিত ছিলেন। রোগী বলিলেন "ডাক্তারেরা সকলেই বাঁশী বাজাতে নিষেধ করেছেন।" এমন সময়ে কবিরাজ মহাশয়ও বলে উঠলেন যে "নিদান ঐ কথাই বলেন ; এ সব রোগে বাঁশী বাজান, ধূমপান একেবারেই নিষিদ্ধ।" তখন আমার হঠাৎ মনে হ'ল যে নিদানে যদি বাঁশী বাজান নিষিদ্ধ, তবে নিদানের রচয়িতা মহাদেবের হাতে শিঙ্গা কেন? মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সামান্য একটু তর্কও হইল। এই প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে দেবদেবীর ধ্যান তাঁহাদের ভক্তরাই রচনা করিয়াছিলেন ; দেবতারা নিজগুণ বর্ণনা করিয়া নিশ্চয়ই নিজ নিজ ধ্যান লিখেন নাই। উপাস্য দেবতার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াই ভক্তরা ধ্যান রচনা করিয়াছিলেন। মাত্র দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ সাগরমন্থনের সময় নিদানরচয়িতা মহাদেব, সকলের পরিত্যক্ত মহাবিষ কালকূট কেন কণ্ঠে ধারণ করিলেন? যে বিষ পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী ছারখার হইত সেই কালকূট, মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর উদরস্থ করিতে ভয় পাইয়াই কি কণ্ঠ হইতে নামাইলেন না?" কবিরাজ মহাশয়ের বিরক্তির মাত্রা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল বুঝিয়াও আমি চুপ করিতে পারি নাই। আমি আবার বলিলাম যে, কণ্ঠে 'ঘড়ঘড়' শব্দ আরম্ভ হইলে অর্থাৎ নিদান অবস্থায় বিষপ্রয়োগই বিধি। তাই নিদানগ্রন্থকারের মূর্ত্তিতে উহা স্বপ্রকাশ। কোন্ বিষ কোথা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও ফণিভূষণ বিশ্বেশ্বর নিজ শ্রীঅঙ্গের সাপ দেখাইয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহাদেবের ন্যায় সাধু-সন্ন্যাসীগণও ভস্ম মাখিয়া থাকেন। সাধুরাই বলিয়া থাকেন যে ছাই মাখিলে শরীরের তাপ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, দারুণ শীতেও গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ভস্মের আরও একটা গুণ আছে, ছাই মাখিয়া থাকিলে বাহিরের উত্তাপ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাই আগুনের সম্মুখে সন্ন্যাসীরা বসিয়া থাকিতে পারেন।

আবার দেখুন, মহাদেব শ্মশানে কেন থাকেন? শ্মশানবাসী ও শ্মশানচারীগণের সুস্থ ও সবল দেহ, শ্মশান-ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবা উহার কারণ প্রদর্শন করিবে। আরও দেখুন, কবিরাজমহাশয়! (এই-খানে কবিরাজ মহাশয় এরূপ রাগ করিয়া আমার দিকে চাহিয়াছিলেন যে, আজ দশ বার বৎসরের কথা হইলেও সে দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে) শিবের কাণে ধুতুরা ফুল, পারিজাত কি শিবের দুষ্প্রাপ্য ছিল? গোলাপ, বেল, জুঁই, গন্ধরাজও কি কৈলাসে ছিল না? তা নয়—কবিরাজ মহাশয়, ঐ ধুতরা পাতায় (Stramonium) চুরুট করিয়া ধূমপান করিলে (যে ধূমপান আপনারা বারণ করছেন) হাঁপানী সারে। বাজারে ঐ চুরুট বিক্রী হয় তাও ত জানেন!"

উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার কথা মন দিয়া শুনিতেছেন দেখিয়া আমি আবার বলিতে লাগিলাম। "শিঙ্গা বাজাইয়া ডমরুর তালে তালে নৃত্য করারও একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। নৃত্য যে স্বাস্থ্যপ্রদ একথা য়ুরোপীগণও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক রকম ব্যাধি নৃত্য দ্বারা প্রশমিত হয়। এমন কি, কতকগুলি ব্যাধি নৃত্যকারীকে আক্রমণ করিতেও পারে না। যখন মহাদেবের অঙ্গের প্রত্যেক আভরণের উপকারিতা বুঝা যাইতেছে তখন 'শিঙ্গার' উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে। উহাতে অনিষ্ট কদাচ হইতে পারে না। যিনি শিব অর্থাৎ, মঙ্গলময় বলিয়া উক্ত হন, তিনি কি কখনও অমঙ্গলকর কোনও জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিঙ্গাও বাঁশী সাধনের একটি সহজ উপায়।"

'সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। আমার রুগ্ন বন্ধুটি বাড়ী ফিরিয়া আমার প্রস্তাব অনুযায়ী বাঁশী বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন দেহ ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া বাঁশীর ওস্তাদ বিফলমনোরথ হইলেন—বাঁশী বাজাইতে পারিলেন না—উপরন্তু বুকে ফিক ব্যথা ধরিল ; অনেক কষ্টে, পরে সুস্থ হইলেন। নিরাশ না হইয়া কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া অবশেষে কোনওরূপে পঞ্চম দিনে বাঁশী বাজাইতে সমর্থ হইলেন। হাঁপানী রোগীর যেমন সামান্য কথা বলিতে গেলেই কাশি হয়, গয়ার উঠে, বাঁশী বাজাইবার চেষ্টার সময়ও সেইরূপ উঠিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যেদিন বাঁশী হইতে সঠিক সুর বাহির হইল, সেই দিন তিনি একখানি গৎ সম্পূর্ণ বাজাইতে না বাজাইতে সবুজ রঙের মাংসপিণ্ডবৎ এক টুক্‌রা গয়ার সবেগে বাহির হইল। উহা দেখিয়া বন্ধুর আমার অত্যন্ত আশা ও আনন্দ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন আজ ৩।৪ বৎসরের মধ্যে এরূপ ধরণের গয়ার কখনও বাহির হয় নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। প্রত্যহ এক আধটুক্‌রা ঐ ধরণের গয়ার উঠিত। এক দিন অনেকখানি একসঙ্গে উঠিয়া যাওয়ায় বন্ধুবর অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিলেন। বাস্তবিকই সেইদিন হইতেই তাঁহার হাঁপানী সারিয়া গেল।

ইহার অনেকদিন পরে আমার এক আত্মীয়ের ৭।৮ বৎসরের কন্যার হাপানী হয়। তাহাকে আমি শাঁখ বাজাইতে বলিয়াছিলাম। উপরোক্ত ঘটনা শুনিয়া তিনিও সাগ্রহে সেইমত ব্যবস্থা করিলেন। ফলে বালিকা রোগমুক্তা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাঁশী বাজাইলে রোগ ত হয়ই না বরং দেহ ভাল থাকে। অন্যায় অত্যাচারে দেহ রুগ্ন করিয়া বাঁশীর দোষ দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত?



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী



তদীয় পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী



উইলিয়ম রদেনষ্টাইন্

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৫ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ববিবাদ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাম্প্রদায়িকতা বিবাদের কারণ।

সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদবিরোধের ভূমিকম্পে সমগ্র সমাজ বিকম্পিত হইয়া উঠে। যেখানে ইহার উৎপত্তি হয় বা সূত্রপাত হয়, কেবল তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে নয়, কিন্তু তাহার চতুঃসীমা ছাড়াইয়াও দেশবিদেশে ইহার আঘাত স্পর্শ করে। এই সকল সামাজিক ভূমিকম্পের কারণ আর যাহা কিছু থাক না কেন, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব যে ইহার আবির্ভাব হওয়ার পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সেদিন যে ভাষণ বিরোধ-বিবাদ রাজধানীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, যাহার শেষ তরঙ্গ কেবল বঙ্গদেশ নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতভূমিকে আজ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রচণ্ড বিরোধবিবাদের অন্তর্নিহিত সত্যাসত্য অন্য কোন কারণ ছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই ; কিন্তু তাহার অন্যতর প্রকাশ্য কারণ যে ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও হিন্দুদিগের শত শাখা, শত ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ভিতর বড়ই তীব্র বিরোধ জাগ্রত ছিল। এই প্রকার বিরোধের কারণেই শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আজ পর্য্যন্ত অনেক স্থলে ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবল সাম্প্রদায়িক বিবাদের উপমাস্থল হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার।

ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের পরস্পরের মধ্যে তীব্র বিরোধবিবাদ এবং তাহার কুফল রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ হওয়াতে তাঁহার স্বভাবত কোমল হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ নির্ম্মূল করিবার উপায় অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের দয়াতে তাঁহার হৃদয় হইতে দুঃখের ব্যথার ভিতর দিয়া অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মহাবাণী সমুত্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম জনসাধারণ গ্রহণ না করিলে, সকল ধর্ম্মের মূল উৎস অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামের অমৃতমন্ত্র উপলব্ধি না করিলে সাম্প্রদায়িকতামূলক বিবাদের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে না, কাজেই সময়ে সময়ে সেই বিরোধের অগ্ন্যুৎপাত জাগ্রত হইবার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে না। এই খাঁটি সত্য উপলব্ধি করিয়া রাজা রামমোহন রায় বলিতে গেলে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারকল্পেই সমস্ত হৃদয় মন অর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের বীজমন্ত্র।

রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকারী স্বরূপে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানের যে "স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ" বীজমন্ত্র ভারতবাসীকে, জগতবাসীকে, দিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য মন্ত্রটী হইতেছে—তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার একমাত্র উপাসনা। এই বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক যে,কোনও ধর্ম্মই এই বীজমন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না। সুতরাং এই বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইলে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতামূলক বিরোধ-বিবাদ আসিবার যে সম্ভাবনাই থাকে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মনাম প্রচারের সময়।

সেই অমোঘ ব্রহ্মমন্ত্র প্রচারের বর্ত্তমান সময়ই তো উপযুক্ত অবসর। বর্ত্তমান সময়ে আমরা জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পুরাতন যুগের প্রাচীন মতামতের প্রাচীন ভাবরাজির জীর্ণ ও শুষ্ক পত্রসকল মর্ম্মরধ্বনির সঙ্গে নিত্যই ঝরিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থলে নবীন যুগের নব নব ভাবের হরিৎপত্রসকল তাহাদের হাস্যমুখ বাড়াইয়া দিতেছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের এই সন্ধিক্ষণে দিকে দিকে তাঁহার মধুময় নামপ্রচারের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঘাতপ্রতিঘাতে সংঘর্ষ-প্রতিসংঘর্ষে যখন আমাদের সমাজের প্রাণ, দেশের জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হইবার উপক্রম করিতেছে, এই চরম সময়ই তো ব্রহ্মনামের সঞ্জীবনী সুধা পান করাইবার উপযুক্ত সময়।

ব্রহ্মমন্ত্রের দুই অঙ্গ।

এই ব্রহ্মমন্ত্রের দুইটী মুখ্য অঙ্গ—একটী ভগবানকে প্রীতি করা, দ্বিতীয়টী তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই দুইটী পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেও একটু আলোচনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে—একটী অন্তর্ম্মুখী, দ্বিতীয়টী বহির্ম্মুখী। অন্তর্ম্মুখী প্রথম অঙ্গ লইয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বড় একটা বিরোধ দেখা যায় না; কারণ সকল সম্প্রদায়েরই এ সম্বন্ধে একই কথা যে, ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে হইবে। এই সত্যটীকে হৃদয়ে ধারণ না করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু এই সত্যটীকে হৃদয়ে ধরিলেও অনেক সময়ে গোলযোগের উৎপত্তি হয় ঐ বীজমন্ত্রের দ্বিতীয় বহির্ম্মুখী অঙ্গ লইয়া—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন লইয়া। কিরূপ কার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইবে, কোন্ কার্য্যই বা সত্য সত্য ভগবানের প্রিয়, এই সকল লইয়াই অধিকাংশ স্থলেই শত মতভেদ ও বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি হয়।

অন্তর্দৃষ্টি ও তাহার ফল।

নিজের অন্তরে দৃষ্টি করিলে ভগবানকে প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত মানবমাত্রেরই পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করা যায়। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের প্রত্যেকের আবশ্যক বলিয়া ভগবান প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে উহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে মানুষ নিজের আত্মার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে এবং নিজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের মূল কোন্ কার্য্য, এক কথায় ভগবানের প্রিয় কোন্ কার্য্য তাহারও সন্ধান পাইবার অধিকার রাখে। এই অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানবের জন্মগত অধিকার। অবস্থাবিশেষে কাহারও অন্তর্দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকে, কাহারও বা তাহা সুপ্ত বা নিদ্রিত থাকে। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত থাকে, তিনি সমগ্র বিশ্বচক্রের ভিতরে এক অনুপম প্রেমবন্ধন উপলব্ধি করেন। সমস্ত প্রেমের মূল, সকল জ্ঞানের উৎস সেই পরমজ্যোতিকে তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন, তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয়, তাঁহাকে বিরোধবিবাদ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না—প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি হৃদয়ে সকলং হস্তগতং—অন্তরে প্রেমসূর্য্য প্রকাশিত হইলে সকলই হস্তগত। তখন বাহিরের স্থূল ও অন্তরের সূক্ষ্ম, উভয়বিধ জ্যোতির এক আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হয়—বাহিরের স্থূল জ্যোতি অন্তরে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয় এবং অন্তরের সূক্ষ্ম জ্যোতি বাহিরে বিকশিত হইয়া পড়ে। যাঁহাদের অন্তরে এই আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ সংঘটিত হয়, সেই সাধকদিগকে আমরা ঋষিপদে বরণ করি।

অন্তর্দৃষ্টি হারাইবার ফল।

সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ভারতের ঋষিরা কেবল কঠোর সংযম ও অন্তর্দৃষ্টির বলে ভগবানকে আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মযোগ অবলম্বনেই তাঁহার প্রিয়কার্য্যেরও সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা ভারতভূমিকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা আমাদের অযত্ন ও নিশ্চেষ্টতার কারণে আমরা সেই অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞানকে হারাইতে বসিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি কতকগুলি বাঁধিবুলি এবং ধর্ম্মের বহিরাবরণ বা খোসা। ব্রহ্মজ্ঞান হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আত্মার স্বাধীনতাও হারাইয়া ফেলিতেছি, সুতরাং কুসংস্কার প্রভৃতি শতবিধ অমঙ্গলের মুল সাম্প্রদায়িকতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাবরণ দেশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; দেশে বিদেশে মূর্ত্তিপূজা, মনুষ্যপূজা প্রভৃতি, জাগ্রত দেবতা অনন্তজ্ঞান পূর্ণপুরুষের স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাম্প্রদায়িক দ্বেষবিদ্বেষের উৎস খুলিয়া গিয়া তাহার পাপপঙ্কে চারিদিক ডুবাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ণ পুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি।

দেশকে যদি আমরা বাঁচাইতে চাই, সমাজকে যদি আমরা সত্যই রক্ষা করিতে চাই, তবে সেই পূর্ণ পুরুষের উপাসনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগের প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। ব্রহ্মনামের অমোঘ পতাকা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের সর্ব্বত্র শান্তির মঙ্গলবায়ু পুনঃপ্রবাহিত হইবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সামঞ্জস্য করিয়া লইলে প্রকৃত মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মিলন সাধিত করিতে গেলে শান্তি সুদূরপরাহত। এই অসঙ্গত সামঞ্জস্য করিবই বা কি? আমাদের দেবতা কি জাগ্রত নন? আমরা যে ভগবানকে জাগ্রত দেবতা বলি, তাহা কি শুধু মুখের কথা, তাহা কি কেবল জনশ্রুতি মাত্র? তাহা কখনই নয়—তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, জ্বলন্ত সত্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখ—দেখিবে, সেই অনন্ত পুরুষ হইতে নিঃসৃত প্রাণের কি খেলাই চলিতেছে, শক্তির কি খেলাই চলিতেছে, জ্ঞানের কি খেলাই চলিতেছে। এই সকলই সেই মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষেরই হস্তের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে। যে অবিনাশী পুরুষকে, যে তৃপ্তির স্থল শান্তির আলয় পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য সহস্র সুখের মধ্যে, সহস্র ভোগবিলাসের মধ্যে প্রত্যেক মানবের প্রাণ অন্তত একবার না একবার অতৃপ্তি ও অশান্তির সুতীব্র জ্বালা অনুভব করে, এবং যাঁহার প্রেমধারা বর্ষিত হইয়া সেই জ্বালা দূর করিয়া দেয়, সেই প্রেমময় দেবতা যদি জাগ্রত না হইবেন তো অন্য কোন্ দেবতাকে জাগ্রত ধরিব? সেই অন্তর্যামী ভগবানকে ছাড়িয়া মৃৎপাষাণ অগ্নিজলকে ধরিয়া কি আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি? আমরা সচেতন পুরুষ, আমাদের জ্ঞান-প্রেম অচেতন বস্তুতে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সেই প্রকার অপূর্ণ আমাদের জ্ঞান-প্রেম অপূর্ণ কোন মনুষ্য বা দেবতাতেও চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান ও প্রেম সচেতন ও পূর্ণপুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চায় এবং পারে।

ঋষিদের ঘোষণা।

ভারতের ঋষিরা সেই মুল সত্য, সেই আনন্দস্বরূপ বিগতবিবাদ অন্তর্যামী ভগবানকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ, ধর্ম্মের খোসা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভিতর যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা আবার অন্তরাত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া নির্ভয়ে উপনিষদের স্পষ্ট ভাষায় ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের নিষ্ফলতা ও অপকারিতা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—"মানুষের শিক্ষার যত কিছু অঙ্গ বা উপকরণ আছে, এমন কি তিন বেদ পর্য্যন্ত, সে সমস্তই অপরা, অশ্রেষ্ঠ; একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত দ্বন্দ্ববিবাদ, সমস্ত দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিবার অনন্যসাধারণ ও অমোঘ উপায়। তাই তাঁহারা অকুতোভয়ে

ধর্ম্মের বহিরাবরণের অনুষ্ঠাতার প্রতি সুতীব্র করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পরব্রহ্মকে না জানিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যাগযজ্ঞ করিতে থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। "মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও বা লোকরঞ্জন বৃথা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মানমর্য্যাদা, যশ ও কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না।" ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিয়া নির্ব্বাক হইলেন। তখন তাঁহাদের আত্মা হইতে এই অমৃতবাণী ফুটিয়া উঠিল—"রসোবৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ, এই নিঃসংশয় সত্য প্রকাশ পাইল—"কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" কেহই শরীরচেষ্টা করিত না, কেহই জীবিত থাকিত না, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জগতের কত লোক হতাশহৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; কত লোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়াও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিরা আমাদের হাতে প্রত্যক্ষভাবে তুলিয়া দিলেও আমরা তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতির বৃথা আড়ম্বর, ধর্ম্মের খোসা লইয়া নিজেদের বিনাশের পথ কিরূপে দিনে দিনে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত করিতেছি তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাই না।

সত্য ও মিথ্যার মিলন অসম্ভব।

আমরা রাজনীতিক্ষেত্রেও যেমন নিত্যই প্রত্যক্ষ করি যে, তেল ও জলের ন্যায় সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই প্রকৃত মিলন হয় না, সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যেও দেখি যে, সমাজ বল, সাংসারিক সুখসম্পদ বল, যাহারই দোহাই দিয়া হোক না কেন, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই মিল হইতে পারে না। এরূপ মিলনসাধনের চেষ্টার ফলে পরিণামে যে কিরূপ দুর্গতি ভোগ হয়, ভারতের ইতিহাস তাহা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছে।

ব্রহ্মপূজায় আহ্বান।

এসো, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিলন সাধনের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের খোসার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ স্থাপনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, তাঁহাকেই আত্মার স্বর্ণসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, এবং বিপদে সম্পদে তাঁহারই প্রদত্ত অমোঘ ব্রহ্মমন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচার করি।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে অগ্নি, মেঘ ও মৃত্যু নিজ নিজ কর্ম্মে ধাবিত হইতেছে। যে মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, মেঘ ও মৃত্যু সকলে মিলিত হইয়া এই জগতের মঙ্গলসাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাগযজ্ঞ, মনুষ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাচরণের বৃথা আড়ম্বরে মত্ত না থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দেবদেব পরব্রহ্মকে জানিয়া সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পূজার্ঘ্য নিবেদন কর এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে সদাসর্ব্বদা নিরত থাক; দেখিবে, নিজের কল্যাণ, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল বিকশিত শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইবে; দ্বেষহিংসা, দ্বন্দ্ববিবাদ বিদূরিত হইবে।

তোমারে নমস্কার।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

সকলের মাঝে এসেছ যে তুমি
তোমারে নমস্কার,
গোপন হৃদয়ে দেখা দিলে তুমি
তোমারে নমস্কার।
এসেছ যে তুমি সুনীল আকাশে
গন্ধমধুর দক্ষিণ বাতাসে
কুসুম-বিকাশে রবি শশী হাসে
তোমারে নমস্কার।

সব সুখে দুখে, আলো ও ছায়ায়
তোমারে নমস্কার,
স্নেহ-প্রীতি এই মমতা-মায়ায়
তোমারে নমস্কার।

জীবনের এই নানা খেলা কাজে
দাঁড়ালে যে দ্বারে কত রূপে সাজে
কতবার এলে—মন যে ভুলালে
তোমারে নমস্কার।

পাঠালে আমারে সংসারে এই
তোমারে নমস্কার,
বন্ধন মাঝে মুক্তি যে দিলে
তোমারে নমস্কার।

প্রতি ধূলিকণা প্রতি তৃণমাঝে
তোমারি মহিমা মাধুরী বিরাজে
দেখিতে যে দিলে ও রূপ নিখিলে
তোমারে নমস্কার॥

উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাসন।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

স্বনামধন্য পাঠানসেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ বিজয় করিবার পর, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যার রাজধানী পুরী নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গবিজয়ের পর উড়িষ্যাবিজয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন মাত্র, সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। টোথন খাঁ নামক পাঠানসেনাপতি ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্য-সামন্ত লইয়া সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কিন্তু সে অভিযানে কোন ফলোদয় হয় নাই। উড়িষ্যার বৃত্তিভোগী সৈন্যগণ দুর্গম গিরিবর্ত্ম হইতে দলে দলে বাহির হইয়া সহজেই পাঠানদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের পাঠানগণ আর একবার উড়িষ্যা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সেবারও তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল। ১৩০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুইশত বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণের সহিত বঙ্গের পাঠানরাজগণের নানা সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই উভয় পক্ষ সন্ধি ভঙ্গ করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই দুইশত বৎসর ব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে পাঠানগণ উড়িষ্যার কিছুই করিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার হিন্দু রাজা মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত হিন্দু রাজা কৃষ্ণরায়কে আক্রমণ করেন। কৃষ্ণরায় দাক্ষিণাত্যের প্রবলপ্রতাপান্বিত হিন্দুনৃপতি ছিলেন; নর্ম্মদা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়াও উৎকলরাজ কৃষ্ণরায়কে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধাবসানে উড়িষ্যার রাজা কৃষ্ণরায়ের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্ধ্রদেশে আজিও কৃষ্ণরায়ের বীরত্বগাথা বালকবালিকার মুখে কীর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণরায় তৈলঙ্গবংশীয় ছিলেন। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। প্রবাদ এই যে, কালাপাহাড় একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানগণ জোর করিয়া তাঁহাকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নবাবকন্যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া মুসলমান হন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার পর তিনি ঘোরতর হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়া দেবমন্দির ভস্মীভূত ও দেববিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ ও বিকৃত করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই যে, তাঁহার জয়ডঙ্কার শব্দেই হিন্দু দেব-দেবীর হস্ত-পদ ও নাসিকা খসিয়া পড়িত। কালাপাহাড়ের উড়িষ্যা অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য, হিন্দু-দেবদেবীর অবমাননা ও হিন্দু-ধর্ম্মের উপর কশাঘাত। তিনি পাঠানবাহিনী লইয়া উড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত ও ছারখার করেন। পুরী নগরী অবরোধ করিয়া জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তিকে রত্নবেদী হইতে বিচ্যুত করিয়া ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রবাদ আছে যে, জনৈক সেবক পাণ্ডা জীবন তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমুখ হইতে সেই অর্দ্ধদগ্ধ দারুমূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ঈদৃশ আচরণে সমগ্র হিন্দুজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহার ফলে হিন্দুগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া নিরাশা ও অবসাদে দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পাঠানবাহিনীর সম্মুখে ফেরুপালের ন্যায় পলাইতে লাগিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পর দাউদ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পরে সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, এবং দাউদ খাঁ উড়িষ্যা দেশে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। মোগল ও পাঠানের মধ্যে সে সময় প্রবল বিদ্বেষ ভাব বর্ত্তমান ছিল।

দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ মোগল কর্তৃক হিন্দুস্থানের সিংহাসন হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ উড়িষ্যায় আসিয়াই আকবরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বঙ্গের পাঠানগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ পাঠানদিগকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া মোগলের সহিত ভাগ্যপরীক্ষা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মোগলদিগের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছিলেন। আকবরের প্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি তোডরমল, মোগলমারী নামক স্থানে পাঠানবাহিনীকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যাকে আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। দাউদ খাঁ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি পাঠান-দিগের শেষ বীর। তাঁহার মৃত্যুর পর উড়িষ্যার পাঠানগণ বহুবার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াও উপযুক্ত নেতার অভাবে কোন বারেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তোডরমল পাঠানদিগকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি উড়িষ্যার জমি জরিপ করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজস্ববিভাগ রূপান্তরিত হইল—ছোট ছোট বিভাগ এক-এক জন তালুক-চৌধুরীর হস্তে সমর্পিত হইল। এই সকল তালুক-চৌধুরীগণ তালুক-কাননগোইর অধীনে কার্য্য করিতেন। এক-একটী পরগণা হইতে, তালুক-কাননগোইগণ রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারের বা জেলার খাজনাখানায় জমা দিতেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক চৌধুরী ও কাননগোর অধীনে খণ্ডায়েত ও পাইক সৈন্য থাকিত। মোগল কাননগোদিগের বংশধরগণ ইংরাজশাসনে জমিদার বলিয়া গণ্য হন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহিত দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইল। দেশের হিন্দু অধিবাসীদিগকে করায়ত্ত করিবার মানসে তোডরমল বর্ত্তমান পুরীর মহারাজার পূর্ব্বপুরুষকে মহারাজা উপাধি দান করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের পূজা ও পাণ্ডাগণের প্রতিপোষণের জন্য তোডরমল বিস্তৃত জমিদারী দান করেন।

১৫৮৭ ও ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ সে সময় বাংলার মোগলাধীন শাসনকর্ত্তা। তিনি সহজেই উড়িষ্যার পাঠানদিগকে পর্য্যস্ত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কৌশলে প্রলোভন দেখাইয়া তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগকে যশোহর জেলায় জাইগীর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত করেন; ভূমিদানের লোভ দেখাইয়া উড়িষ্যার নানা স্থানে পাঠানদিগের এক-একটী বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই ভেদনীতির বলে পাঠান-গণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সহনশীল ও ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হন। কিন্তু স্ফুলিঙ্গেই সেই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টা অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উপ-যুক্ত নায়কের অভাবে মারহাট্টা সৈন্যগণ লুণ্ঠনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহারা উড়িষ্যার দুর্গমপ্রদেশে সেনা-সমাবেশ করিয়া সুবিধামত বাংলার সমতল ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিত। এই সকল লুণ্ঠনকারী মারহাট্টা সৈন্যগণকে বর্গী বলিত। মোগল ফৌজ তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবন করিলে তাহারা উড়িষ্যার দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া যাইত। সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া বিনাশ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বাংলার মোগল শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁ বাংলাদেশে শান্তিরক্ষার জন্য মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন। ১৭৫১ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মারহাট্টাগণ উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

আকবর বাদশাহের দূরদর্শী সেনাপতিগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই নীতির ফলে প্রায় শতাধিক বর্ষ উড়িষ্যায় শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। গুরুতর অরাজকতা সেই সময়ের মধ্যে কোন দিন দেশের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে নাই। মোগলসাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বাভাসের সহিত উড়িষ্যার মোগলশাসনকর্ত্তারা যথেচ্ছা-চারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজার সুখশান্তি বা শাসন-কার্য্যের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনের জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তবুও মোগলশাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত উড়িষ্যাদেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা কোন দিন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টাশাসনের সূত্রপাতের সহিত উড়িষ্যায় নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায় প্রজাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মারহাট্টাগণ উড়িষ্যায় কোন দিন শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মারহাট্টাগণ তাঁহাদিগের নিজের দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়া, যে প্রকার সুচারুরূপে শাসনকার্য্য চালাইতেন, হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। উড়িষ্যা নামমাত্র নাগপুরের ভোন্‌সলা রাজার অধীনে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মারহাট্টা সামরিক শাসনকর্ত্তাই দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই শাসনকর্ত্তার পদপ্রার্থী হইয়া লোক নাগপুর-দরবারে নীলামের ডাক ডাকিত

এবং যাহার উৎকোচ বা উপঢৌকনের মাত্রা বেশী হইত তাঁহাকেই শাসনের ভার দিয়া নাগপুর-দরবার উড়িষ্যায় পাঠাইতেন। ফলে মারহাট্টা শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। সময় সময় লুট-তরাজ করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হইত না। মারহাট্টা অশ্বারোহী সৈন্যগণ লুণ্ঠন-কার্য্যে শাসনকর্ত্তার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। হিন্দু মুসলমান-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া মারহাট্টা শাসনকর্ত্তারা পরস্বাপহরণ করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করিতেন। পুরীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার প্রথা মারহাট্টাগণই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর প্রতি মারহাট্টাগণের কোনও সহানুভূতি ছিল না। পাঠানগণের ন্যায় এদেশে চিরস্থায়ীরূপে বাস করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। দেশব্যাপী অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকার করিবার চেষ্টা নাগপুর-দরবার কোন দিন করেন নাই। উড়িষ্যায় যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইত, নাগপুর-দরবার তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন না। দেশব্যাপী অরাজকতার ফলে ১৭৭০ ও ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক সেই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জমিদারদিগকে যে কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে মারহাট্টাদিগের কোষাগারে জমা দিতে হইত। কিস্তী খিলাপ হইলে বা রাজস্ব সামান্য পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম হইলে, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাভোগ করিতে হইত। কথিত আছে যে, সে সময় কিস্তী খিলাপকারী জমিদারদিগের জন্য এক-একটী বৃহৎ লৌহ পিঞ্জর থাকিত; সেই পিঞ্জরে ধান ও জল খাইয়া তাহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইত। ফলে রাজস্ব খিলাপকারীগণ বন্দী হইবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, বন্দী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মারহাট্টাগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন এবং তাঁহার স্থলে আর একজন রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। লুণ্ঠন ও পীড়নের চাপে, গ্রাম-সকল অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রাণভয়ে জীবন্মৃত হইয়া রহিতেন। দেশবাসিগণ এইরূপ নির্ম্মমভাবে সর্ব্বদাই পদদলিত হইয়া জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ গ্রামে এক-একটী গড় বা দুর্গবিশেষ নির্ম্মাণ করিলেন। দূরে মারহাট্টা অশ্বসেনা আসিতেছে শুনিতে পাইলেই দেশবাসিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বহুমূল্য সম্পত্তি ও পুত্র-কলত্র লইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মারহাট্টা সৈন্য চলিয়া গেলে পর তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে পুনরায় গমন করিতেন। গড়াধিপতি আশ্রয়দাতাগণ দুই চারদিনের জন্য নিজপুরে তাঁহাদিগকে আহার্য্য সামগ্রী যোগাইতেন। গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সকলেই গড়াধিপতির অনুগত থাকিতেন; এবং আপদে বিপদে সাহায্য করিয়া উপকারের ঋণ পরিশোধ করিতেন। আজিও উড়িষ্যার নানাস্থানে এই সকল গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রায় সমস্ত গড়ই একই প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে একটী গভীর পরিখার বেষ্টনীর মধ্যে মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ বাঁধ দেওয়া যাইত। এই বাঁধটীর উপর ঘন-সন্নিবিষ্ট কাঁটা বাঁশের ঝাড় লাগান হইত। কিছুদিন পরে কাঁটা বাঁশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ের বহিঃপ্রাচীরস্বরূপ বিরাজ করিত; তীর বা কামানের গুলিও সে প্রাচীর সহসা ভেদ করিতে পারিত না। পরে অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়তন পরিখা ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের বেষ্টনী দেওয়া হইত। প্রত্যেক গড়ের ভিতর বিস্তৃত গোলাঘর, সেনানিবাস ও সাধারণ প্রজার আশ্রয়স্থান থাকিত। রাজার "নবর" বা প্রাসাদ গড়ের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইত। দুইটী পরিখা-বেষ্টনীর উপর টানা পুল থাকিত। সেখানে সশস্ত্র সৈনিকগণ গড়রক্ষার জন্য সর্ব্বদা পাহারা দিত। এইরূপ দুর্গ দখল করা মারহাট্টা সৈন্যগণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল।

মারহাট্ট-শাসনের অরাজকতা উড়িষ্যার জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী অত্যাচার লুণ্ঠন এবং অবিচারে দেশের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। উড়িষ্যাবাসীদিগকে অনেকে গণ্ডীবদ্ধ দুর্ব্বল ও ভীরুস্বভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু-রাজগণের ইতিহাসে উৎকলীয়দিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের অনেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অনেকের মতে পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী ভীষণ অরাজকতার ফলে উৎকল-বাসীর যে নৈতিক অবনতি হইয়াছিল, এখনও ইহারা তাহা শোধরাইতে পারে নাই।

উড়িষ্যার মারহাট্টা সামরিক শাসনকর্ত্তা যে শাসন-নীতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা ও নির্ম্মমতা কল্পনায় হৃদয়ঙ্গম করিলে এতদ্দেশবাসিগণের তৎকালীন নৈতিক অবনতির কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। যে কোনও দেশে এইরূপ অরাজকতা এবং অবিচার হইলে জাতীয় চরিত্র উৎকলবাসীর মত হীন ও অবনত হইত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

অরাজকতার গভীর ছায়াপাতেও ধর্ম্মপ্রাণ উড়িষ্যাবাসীর নির্ম্মল হৃদয় কোনও দিন চিরস্থায়ী ভাবে নৈতিক অবনতির পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয় নাই। যে দেশে প্রতাপরুদ্রের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ রাজা ছিলেন ও যে দেশকে মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারের কর্ম্মভূমি করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় সে দেশের অবনতি কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বস্তুতঃ উড়িষ্যাবাসীদিগের দৈনিক জীবনে আজিও আমরা ভক্তি, প্রীতি, সৎসাহস ও সাধুতার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মারহাট্টা শাসন-যুগে অরাজকতার ছায়া দেশে যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা দেশের ধনাঢ্যগণই অনেক পরিমাণে হীন-স্বভাব হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশের কৃষাণ, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের বিশেষ কোনও অবনতি হয় নাই। তাহারা এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, সরল উদার-স্বভাব ও সত্যব্রতী রহিয়াছে। সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে এখনও যে নৈতিক বল দেখা যায়, তাহা দেশের কার্য্যে নিয়োজিত হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বঙ্গ ও গঞ্জাম প্রদেশে মারহাট্টার লুণ্ঠন-ভীতি নিবারণের জন্য উড়িষ্যা বিজয় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং স্বল্পায়াসেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। ইংরাজ সৈন্যের আগমনে মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিলেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, উড়িষ্যায় মারহাট্টার শাসন-পদ্ধতি দেখিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন যে, মহাশক্তিশালী মারহাট্টা জাতির শাসনপ্রথা এই ভাবেরই ছিল। তাঁহাদের দেশে এবং সন্নিকটবর্ত্তী বিজিত দেশে তাঁহাদের শাসনশৃঙ্খলা সুনিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু পাণিপথ যুদ্ধের পর মারহাট্টা জাতির মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছিল এবং আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে মারহাট্টা ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়াছিল। মহাবীর শিবাজী বা বাজীরাও আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন বিশৃঙ্খল মারহাট্টা-শাসনা, অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অবনতি এবং সুদূরস্থিত সামরিক শাসনকর্ত্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিতে পারে নাই। একটা জাতি পতনোন্মুখ হইলে যে সব দোষ ঘটে, পতনোন্মুখ মারহাট্টা জাতিরও তাহাই ঘটিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্বাধীনতাপ্রিয় শৌর্য্যশালী মারহাট্টাজাতি ভারতে এক বিরাট হিন্দুসাম্রাজ্য গঠনের উন্মাদনায় বলদৃপ্ত মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল, পতন সময়ে নেতৃহীন সেই জাতিই যে অর্থপ্রিয় লুণ্ঠনকারী বর্গীর দল গঠন করিয়া অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল—ইহা কালের অমোঘ বিধান। এই সব অত্যাচার-কাহিনীর মধ্যেও তাঁহাদের উদারতা, ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দানশীলতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উৎকলের অনেক মঠ ও দেবমন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য মারহাট্টা-শাসনকর্ত্তাদের প্রদত্ত জায়গীর ও বৃত্তি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রজার মঙ্গলের জন্য বাঁধ পরিখা ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

বিশেষ, বিজিত জাতিকে নিপীড়ন করা এবং তাহাদের জাতীয় চরিত্র বিমলিন ও হীনপ্রভ করা সভ্যতাভিমানী জাতির মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। নব-বলদৃপ্ত সুসভ্য জাপানের কোরিয়া-শাসনপ্রণালী কি লুণ্ঠনকারী বর্গী অপেক্ষাও ভয়াবহ নহে? আফ্রিকাদেশে বেলজিয়ান জাতির কঙ্গোশাসন-প্রথা কি বর্গী অপেক্ষা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নহে? আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও নিগ্রোজাতির উপর স্বাধীনতাপ্রিয় বীর-স্বাভিমানী মার্কিন জাতির অত্যাচার কি বর্গীর অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে? সুতরাং মারহাট্টা জাতির পতনসময়ে যে লুণ্ঠনপ্রিয়তা, অত্যাচার ও বিজিত জাতির নিষ্পেষণ দেখা যায়, তাহা আধুনিক অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল নহে; এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির চরিত্রের বিচার করা চলে না।

"নীরব ভগ্নী" সম্প্রদায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইটালি যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, তথাকার "ট্র্যাপস্‌ট্" সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের আমরণ নীরবতা সাধন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন। কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানেন যে, ফ্রান্সে এক ভগ্নী-সম্প্রদায় আছে, যাহার সভ্যগণ "কখনও কথা বলেন না।" অনেক পুরুষ মানুষ ইহা শুনিয়া হয় তো অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন, কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। বিয়ান্‌ট্রিজ নামক স্থানের নিকটে ইহাঁদের একটা মঠ আছে। সেই মঠে ইহাঁরা স্বেচ্ছায় নীরবতা সাধনে ব্রতী হন। নির্জন কারাবাস গুরুতর অপরাধের শাস্তি বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য! এক দল স্ত্রীলোক,—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভদ্রমহিলা,—পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেহকে পীড়ন করেন, একটী ছোট ঘরে বাস করেন এবং ভগবৎপ্রদত্ত বাক্‌শক্তির মহান অধিকার ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যসত্যই দূরে পরিত্যাগ করেন। আমরা

যাহা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ করি, তাঁহারা তাহাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন—তাঁহারা স্বেচ্ছায় বধির ও মূক হন। বধির, কারণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলিবার কেহ থাকে না; এবং মূক, কারণ কথা কহিবার জন্য তাঁদের মুখ খোলা নিষিদ্ধ। যতদূর জানা যায়, সমস্ত পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছায় আমরণ নীরবতা সাধনের ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য এই একটী মাত্র মঠ আছে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে এই বিচিত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই মঠের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটী মহিলাকে সর্ব্বদাই থাকিতে দেখা গিয়াছে—তাঁরা মঠ ছাড়িয়া কোথাও যান না, পরস্পরের সহিত কখনও বাক্যালাপ করেন না, প্রার্থনার সময় ব্যতীত অথবা কাজের সময় প্রয়োজন না হইলে কখনও চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন না, বাগানে নীরব পদক্ষেপে ভ্রমণ করেন। মুখের উপর লম্বা কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া রাখেন, যাহাতে তাঁহারাও কাহাকে দেখিতে না পান এবং অপর কেহও তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়। এই প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁরা মঠের গির্জ্জায় অবনত মস্তকে এবং বক্ষের উপরে দুইটী হাত উপর্য্যুপরি রাখিয়া যাইতে থাকেন। তাঁহারা এই প্রকারে সংসারের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার আশায় বৎসরের পর বৎসর গির্জ্জা হইতে refectory, এবং তথা হইতে বাসগুহায় নীরবে গম্ভীরভাবে নিত্য যাতায়াত করেন—বাহিরের মুক্ত সুনীল গগনের প্রতি তাকাইতেও যেন তাঁরা ভয় পান।

ফটক হইতে বালির একটা রাস্তা চলিয়াছে, তার দুই ধারে উচু কৃষ্ণবর্ণ পাইন বৃক্ষের সারি চলিয়াছে এবং নাগফণির বেড়া চলিয়াছে, যাহাতে কেহ কোনমতে নিকটে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে না পারে। "ভগ্নী"-গণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কে আসিল বা কে গেল, সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁদের নিঃশব্দে কৃত সমস্ত কাজের উপর যেন দুঃখের একটা আবেষ্টন পড়িয়া থাকে। বোধ হয়, তাঁরা যখন গাছের পাতা কাটা প্রভৃতির মত বাহিরের কোন কাজে লিপ্ত থাকেন, তখনই সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়া পাখীদের কলকণ্ঠের গান শুনিয়া প্রাণটাকে একটু জুড়াইতে পারেন।

স্বভাবতই, কোন নীরবভগ্নী কোন অতিথিকে মঠাদি দেখাইয়া বেড়াইতে পারেন না, আগন্তুক কাহারও সঙ্গে থাকা গুরুতর অপরাধ, অপরিচিত কোন ভাষায় তাঁহাদের কাহাকেও প্রশ্নাদি করা তাঁহার পক্ষে অপমান-জনক। কাজেই ইহাদের মঠের নিকটে আর একটী যে বৃহৎ মঠ আছে, যেখানে সুন্দর সূচীশিল্পের কার্য্য হয়, সেই মঠ হইতে দুইটী "ভগ্নী" আসিয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। এই নীরবতার সমাধিমন্দিরে প্রতি পদক্ষেপে দেয়ালে লিখিত এক-একটী প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

মঠের ভিতরেই একটী প্রার্থনামন্দির আছে—খুব সাদাসিদা, সম্পূর্ণ অলঙ্কারবিহীন। কিন্তু উহারই মধ্যে দেখা যায় যে, মঠের ডান দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহ শুভ্র ক্যালিকো পর্দ্দার দ্বারা সমাবৃত। এই গৃহে "নীরবভগ্নী"-গণ নিজেরা প্রার্থনা করেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই ভোর সাড়ে চারিটার সময় তাঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহারা ৪॥ ঘটিকা হইতে ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই গৃহে মালা জপ করেন। পরে আরও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহারা নীরবে প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। রাত্রিয়াতে "বলমো" নামে এক সুপ্রসিদ্ধ "বিহার" ছিল; সেখানে প্রতিদিন মধ্য রাত্রে এইভাবে প্রার্থনার জন্য সন্ন্যাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করা হইত। তাঁহারা গ্রীকপন্থী বলিয়া প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকপন্থী এই নীরবপন্থী অদ্ভুত সম্প্রদায় নিজেদের প্রার্থনামন্দিরেও নীরব!

এই নীরবভগ্নীগণ প্রতিদিন "কর্ত্রীমাতা"র নিকট হইতে যথাকর্ত্তব্যের আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ইহাদিগকে নামের পরিবর্ত্তে সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। ঐ আদেশ ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু যদি কার্য্যসূত্রে কোন প্রশ্ন করা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তাহার একটী উত্তরও গ্রহণ করিতে পারেন—ইহার অধিক নয়। কথোপকথন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

মঠে শিক্ষানবিস হিসাবে তাঁহাদিগকে দুই বৎসর থাকিতে হয়। তাহার পর যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবেন। ব্রতগ্রহণের পর কেহই মঠের সীমা অতিক্রম করেন না, এমন কি মৃত্যুতেও নয়। মঠের সীমার ভিতরেই একটী সমাধিস্থান আছে সেখানে বালুকার নিম্নে মৃতব্যক্তিকে সমাহিত করা হয় এবং কতকগুলি শামুক ঝিনুকের দ্বারা সেই কবর চিহ্নিত করা হয়। যাঁহারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই মাটি খুঁড়িয়া কবর প্রস্তুত করেন, শবদেহ ধীরে ধীরে তুলিয়া শুভ্র বস্ত্রে আবৃত করেন এবং সেই গর্ত্তে নামাইয়া দেন; সকলে মিলিয়া বালুকা দ্বারা সেই গর্ত্তটা পূর্ণ করেন এবং সেইখানে বালুকার একটা স্তূপ করেন। একমাত্র সাগরকূলে প্রাপ্ত শামুক-ঝিনুকই সেই কবরকে সমলঙ্কৃত করে, একটীও ফুল দেওয়া হয় না, বা কোন প্রস্তরফলকের দ্বারাও উহা চিহ্নিত করা হয়

৩

না। এ প্রকার মর্ম্মস্পর্শী সমাধিব্যবস্থা অপর কোন স্থানে আছে বলিয়া শোনা যায় না।

মঠের দরজা খুলিয়াই refectoryতে প্রবেশ করিতে হয়। ঘরটী এতই অন্ধকার যে প্রবেশ করিবার সময় ভয়ে গা ছমছম করিতে থাকে। এই ঘরে কোন রকম পাকা মেজে নাই—বালুকারাশি মাত্র। এই বালুকারাশিতে পা ডুবিয়া যায়। ঘরের দুই দিকে কাঠের লম্বা টেবিল ও বেঞ্চি আছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট দেরাজ আছে, টেবিলের উপর একটী তোয়ালে রাখা থাকে তাহাই টেবিলঢাকার কাজ করে, সেই সঙ্গে কাঠের চামচ কাঁটাও থাকে।

ঘরটী অত্যন্ত শীতল, এমন কি বসন্ত কালে, যখন গোলাপফুল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সে সময়েও ঘরটী অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে বোধ হয়। সেখানে আগুন জ্বালাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। বুঝাই যাইতেছে, শীতকালে ভগ্নীগণকে কি কষ্টই সহ্য করিতে হয়। টেবিলের উপর অল্প অল্প ব্যবধানে জলপূর্ণ নানা আকার ও বর্ণের মাটির পানপাত্র সাজানো থাকে। তাঁহাদের আহারও খুব সাদাসিদা, কিন্তু তাঁহাদের আহারের সময় কেহ উপস্থিত থাকিতে পাবে না। ঐ অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে এই ভগ্নীগণ নীরবে খাদ্য গ্রহণ করেন। এস্থলেও তাঁদের কোনপ্রকার অনুরাগ বা সহানুভূতি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ!

প্রতি শুক্রবার, কষ্টসহনের মাত্রা বাড়াইবার জন্য ভগ্নীগণ হাঁটু গাড়িয়া আহার করেন! তাহা ব্যতীত "কর্ত্রীভগ্নী" যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাজাইলেই প্রত্যেক ভগ্নী সেই মুহূর্ত্তে যে অবস্থায় থাকেন, ঠিক সেই অবস্থায়ই থাকিতে হইবে। হয়তো কাঁটা দ্বারা বিঁধিয়া আলু কেহ মুখে ফেলিতে যাইতেছেন, কেহ বা পানপাত্র তুলিয়া জলপানে উদ্যত হইয়াছেন—যিনি যে অবস্থাতেই ঘণ্টা শুনিবেন, তিনি কর্ত্রীভগ্নীর অধীনতা ও নিজের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকিবেন। পুনরায় ঘণ্টা বাজিলে তবে তাঁহারা পুনরায় আহারে অগ্রসর হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন, এই প্রকার অধীনতাকেই তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আত্মবলি মনে করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা সিদ্ধির অত্যুন্নত অবস্থা মনে করেন। তাঁহাদের মন্ত্র হইতেছে "একমাত্র ঈশ্বর"। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল নীরব প্রার্থনা—তাঁহাদের শরীর খুব সাদাসিদা খাদ্যের দ্বারা রক্ষিত হয়। আমোদ-প্রমোদ এমন কি গ্রন্থপাঠ—এ সমস্তেরই সম্পূর্ণ অভাব বলিলেই হয়। কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহারা কর্ত্রীমাতাকে বলিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত অসুস্থ হইলেই চিকিৎসক আনা হয়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় ভগ্নীদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তহীনতার প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়।

মঠের সীমার ভিতরেই ছিটেবেড়া ও তৃণাচ্ছাদিত একটা ঘর আছে—তাহাই এই সম্প্রদায়ের সংস্থাপিত সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা। ইহারই নিকটে ঐ প্রকার আর একটী গৃহ দেখা যায়—ইহার কোনও দরজা জানালা নাই, কেবল সম্মুখস্থ দরজার শিরোদেশস্থ অর্দ্ধেকখানি একেবারে খোলা—তাহার ভিতর দিয়াই যেটুকু আলো প্রবেশ করে। সেই ঘরে একটী ছোট লোহার খাট, একটা ছোট স্নানপাত্র, একটী বাক্সের উপরে একটী পানপাত্র এবং একটী চৌকি। বর্ত্তমান মঠ প্রস্তুত হইবার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইহাই মঠরূপে ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, এই ঘরের দরজা দিয়া হিম প্রবেশ করিত এবং "খড়ের চাল" দিয়া বৃষ্টি প্রবেশ করিত। এখনকার মঠের ছাদ দিয়া আর জল পড়ে না এবং এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশের জন্য একটী ঢাকা পথ আছে। অন্যদিকে যে কিছু বেশী সুবিধা হইয়াছে তাহা নয়। তাঁহাদের ঘরের প্রত্যেক কোণে "একমাত্র ঈশ্বর" লিখিত আছে—ঈশ্বরের জন্য দেহমনপ্রাণ সমস্ত বলি দেওয়াই হইল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য।

ইহাঁদের পোষাক সাদা ফ্লানেলের নির্ম্মিত। সুদীর্ঘ ফ্লানেলনির্ম্মিত apron গলা হইতে প্রায় গোড়ালি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। তাঁহারা দড়ির প্রস্তুত একটী করিয়া কোমরবন্ধ পরেন, কিন্তু খালি পায়ে চলেন না, sabot পরেন। তাঁদের দেহের একদিকে এক বৃহৎ জপমালা থাকে এবং বক্ষের উপরে তাঁরা ধাতুনির্ম্মিত একটী ক্রশ্ ধারণ করেন। মস্তকে খুব আঁটসাঁট্টা সাদা কাপড়ের টুপি পরেন। সমস্তের উপরে একটা কৃষ্ণবর্ণের অবগুণ্ঠন পরেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের মুখ প্রায়ই সমস্তটা ঢাকা পড়ে, এই অবগুণ্ঠনের পশ্চাৎ দিকে একটা বস্ত্রখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রশ সেলাই করা আছে। যখন তাঁহারা বাগানে যান, তখন বেঙ্গের ছাতার মত প্রকাণ্ড খড়ের টুপি পরেন—এই টুপি এত বড় যে, ইহার নিম্নে মানুষটী অতি ক্ষুদ্রকায় বোধ হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটন যে স্থানে তাঁর প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের সংলগ্ন স্থানে এই সম্প্রদায় থাকেন বলিয়া সম্ভবত মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিয়ারিট্জে সাম্রাজ্ঞী ইউজিনীর সহিত অবস্থানকালে এই মঠ একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

এখানকার সমস্তই এত নিস্তব্ধ যে, মনে হয় যেন পাখীরাও গান গাহিয়া এখানকার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতে সাহস করে না। যে সকল ভগ্নী অতিথি ও আগন্তুকদিগকে পথ দেখান, তাঁহারা নিজেও ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা বলেন এবং অভ্যাগতদিগকেও সেই প্রকারে কথা কহিতে অনুরোধ করেন।

চারিদিকে যে সমস্ত প্রবচন লিখিত আছে, সেগুলির একটীও হর্ষোদ্দীপক নয়, সেগুলির অধিকাংশ মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অথবা বলিয়া দেয় যে আমরা পাপী।

আশ্চর্য্য এই যে, জ্ঞানোন্নত ইউরোপের মধ্যে আজও এইরূপ কুসংস্কারান্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায় কাহারও কোন উপকারসাধনে অগ্রসর হন না; কোন রোগীর সেবায় নিরত হন না; বালক-বালিকার শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন না; মদ্যপায়ী বা দুষ্কর্ম্মনিরতদিগের সংশোধনে জীবন উৎসর্গ করেন না। এই সকল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে রত হইবার পরিবর্ত্তে দেহ ও মনকে শুকাইয়া ফেলিয়া ইঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন। *

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী।

(শ্রবাণী দেবী)

১। সঙ্গীতের উন্নতিসাধনে সামঞ্জস্য আবশ্যক।

বর্ত্তমানে সকল বিষয়েই দলাদলির একটা হাওয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এখন আমরা অধিকাংশ স্থলেই ধীরভাবে বিচার করা ছাড়িয়া দিয়া নিজের নিজের জেদ বজায় রাখিতেই অগ্রসর হই বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীতের ন্যায় মধুর, কোমল ও অসাম্প্রদায়িক বিষয়ও এই দলাদলির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। প্রাচীন ও নবীন, এই উভয়পন্থীদিগের কেহ কাহারও বক্তব্য ধীরভাবে শুনিয়া বিচার করিতে চান বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীনপন্থীরা যদি বলিলেন যে, সঙ্গীত যদি বলিতে হয় তো ধ্রুপদকেই বলিতে হয়, অমনি তদুত্তরে নবীনপন্থীরা বলিলেন যে, ধ্রুপদ তো সঙ্গীতই নয়, উহা কতকগুলি স্বরের যেন-তেন-প্রকারেণ সংমিশ্রণ মাত্র; সঙ্গীত যদি বলিতে হয়, তবে টপ্পাই প্রকৃত সঙ্গীত; কারণ উহা দ্বারা শত শত লোকের মন বিমুগ্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাকড়ার প্রাণ যায়—প্রাচীন ও নবীনপন্থী মহারথীদের মধ্যে মহাবিবাদ লাগিয়া যায়, মধ্য হইতে, এই সকল গোলমাল দেখিয়া কোন্ প্রকার সঙ্গীত চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে জনসাধারণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ প্রাণের সহিত সঙ্গীত ভালবাসেন এবং চান যে, জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার প্রসারিত হৌক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য—এই দুর্দ্দিনে কলহবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্বসকল খুঁজিয়া বাহির করিয়া উভয়পন্থীর মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা, উভয় পন্থীর ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া।

* পিয়াসন ম্যাগাজীন।

২। নবীন পন্থী।

ভারতের নবীনপন্থীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান বলিতে গেলে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ। নবীনপন্থীদিগের বিরক্তিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, সত্যকথা বলিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, অনেক স্থলেই আমরা দেখি যে, তাঁহারা নানা কারণে প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরই মতামত সকল বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া পুনঃপ্রকাশিত করেন। তাঁহারা এই প্রকারে যেসকল ধারকরা যুক্তির অবতারণা করেন, আমরা সসঙ্কোচে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বভাবতই তাহার অনেকগুলি আমাদের নিকট বড়ই ভাসাভাসা বোধ হয়—তাহাদের সারবত্তা খুবই অল্প বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সম্প্রতি কয়েকজন প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞ প্রাচ্য সঙ্গীতের সুমিষ্ট রস প্রাণে উপলব্ধি করিয়া উহার সপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছেন দেখা যায়। সুতরাং আশা হইতেছে, নবীনপন্থাগণও শীঘ্র ঐ সকল প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞদিগকে অনুসরণ করিয়া আমাদের চিরন্তন প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে অগ্রসর হইবেন।

৩। মর্ম্মগ্রহণে অনুরাগ আবশ্যক।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সঙ্গীতবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হন। তাঁহাদের অনেকেই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মুখস্থ বিদ্যার উপরেই নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে উদ্যত হন। যে দুইচারিজন প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদেরও মধ্যে কয়জনই বা প্রাচ্য সঙ্গীতের মর্ম্মে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন? সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে কোন ললিতকলা বল, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রতি একটা আন্তরিক গভীর অনুরাগ চাই। হৃদয়ের প্রকৃত অনুরাগ ব্যতীত কোন ললিতকলার মর্ম্মগ্রহণ করা অসম্ভব। যে ললিতকলার প্রতি যাহার যে পরিমাণে অনুরাগ উপজাত হইবে, তদনুপাতেই অনুরাগী ব্যক্তি সেই কলার মর্ম্মকথা ধরিতে পারিবেন।

ভারতীয় সঙ্গীত ও শ্রুতি।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাচ্য সঙ্গীতের অনুরাগী ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীর সংখ্যা কম হইবার কারণ এই যে, প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীত বলিতে গেলে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অজ্ঞাত। পিয়ানোর বাঁধা ঠুনঠুনির ভিতর দিয়া বা হারমোনিয়মের বাঁধা সুরের ভিতর দিয়া অসম্পূর্ণ স্বরলিপির সাহায্যে প্রাচ্যসঙ্গীতের সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট ভাবসকল প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ প্রাণ বা বৈশিষ্ট্যই হইল ঋষিদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন

স্বরমধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম শ্রুতিসমূহ। সেইসকল সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম শ্রুতি অবলম্বনেই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। সুগায়কের সিদ্ধকণ্ঠের ন্যায় কোনও যন্ত্রেই ঐ শ্রুতিসমূহ সুচারুরূপে পরিস্ফুট হয় না। বেহালা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে স্বর হইতে স্বরান্তরে নামিবার কালে অন্তঃস্বরসমূহে সহজে ও স্বাধীনভাবে ওঠা-নামা যায়, সেই সকল যন্ত্রেই শ্রুতিসমূহের কতকগুলিমাত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু পিয়ানো প্রভৃতির ন্যায় বাঁধা সুরের কোনও যন্ত্রেই অন্তঃস্বরগুলি, সুতরাং শ্রুতিসমূহও সম্যক প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রুতি বুঝিবার জন্য অনুরাগ চাই।

এই সকল শ্রুতি উপলব্ধি করিবার জন্য আন্তরিক অনুরাগ চাই এবং সেই সঙ্গে অভ্যস্ত কান চাই। শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেশীয় সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কানে সেই সঙ্গীত "জংলী গান" বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই সেদিন বিলাতে সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় এক আন্তর্জ্জাতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা ভারতীয় সঙ্গীতকে অম্লানবদনে কতকগুলি সুরের অযথামিশ্রণ বা jumble of sounds বলিয়া উল্লেখ করিলেন।* ইহাতে তাঁহাদেরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। আমরাও যখন সর্ব্বপ্রথম বিদেশীয় গান শুনিয়াছিলাম, তখন তাহার তার-স্বরের 'কু'-ধ্বনি আমাদের কানে বড়ই কর্কশ লাগিয়াছিল। ক্রমে অনুরাগভরে শুনিতে শুনিতে উহারও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিলাম। সেইরূপ আমরা নিশ্চয়সহকারে বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরাও মনোযোগ সহকারে অনুরাগভরে প্রাচ্য সঙ্গীত শুনিতে থাকিলে উহার ভিতরকার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং শ্রুতির মহিমা বুঝিতে পারিবেন। ভারতে পাশ্চাত্যদিগের প্রথম আবির্ভাবকালে তাঁহারা এদেশের সাহিত্য, দর্শন, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কোন-কিছুরই ভিতরে ভাল কিছুই দেখিতে পান নাই—সমস্তই বর্ব্বরোচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় অনুরাগভরে আলোচনা করিবার ফলে এখন তাঁহারা ঐসকলের প্রশংসা শতমুখে ধ্বনিত করেন। এতদিন পরে যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুরাগভরে ভারতীয় সঙ্গীত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, অনতিবিলম্বে ভারতীয় সঙ্গীত তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। এখনও সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্যগ্রন্থসমূহে ভারতীয় সঙ্গীতের কথা স্থান তো পায়ই না; যদি বা এককোণে একটু স্থান পায়, তবে তাহাকে দুইচার কথায় নিতান্ত "আদিমতম" অর্থাৎ বর্ব্বর অসভ্যদিগের উপযুক্ত গান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহাতে ঐ সকল শ্রোতা ও গ্রন্থকার প্রভৃতিরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় মাত্র। দুঃখের বিষয়, অনেক সুশিক্ষিত ভারতবাসীও নিজেদের দেশের সঙ্গীতের প্রকৃত ধারার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং পিতৃপিতামহাগত শিক্ষার মূল প্রাণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল কতকগুলি ভাসা-ভাসা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রাচ্যসঙ্গীতে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যগ্রন্থকারদিগেরই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন দেখা যায়।

সঙ্গীতের প্রাণ অসাম্প্রদায়িক।

ভগবান সঙ্গীতের ভাব মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাই কোথায় সুমেরু, আর কোথায় কুমেরু, সকল স্থানেই দেখা যায় যে, লোকেরা গান গাইয়া অন্তরে আনন্দস্বরূপের আভাসলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। কিন্তু একই সূর্য্যের কিরণধারা যেমন গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশে বিভিন্ন আকারে ও শক্তিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। দেশ ও জাতিবিশেষে সঙ্গীত বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইলেও উহার মূলপ্রাণ হইল অসাম্প্রদায়িক—সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতার অতীত। সঙ্গীতের মূলপ্রাণে দেশ-কাল-অবস্থাভেদে কোন প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ।

প্রাচ্যসঙ্গীত ও রাগরাগিণী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে এই প্রকার প্রভেদ বা বিভিন্ন আকারের অভিব্যক্তির কারণ কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রাচ্যসঙ্গীত প্রধানতঃ melody বা রাগ-রাগিণীর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে, পাশ্চাত্য-সঙ্গীত প্রধানতঃ harmony বা স্বরসম্বাদের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার কারণ কি? যাঁহারা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এবং ভারতের ইতিহাসের ধারার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রভেদের কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। আলোচনার ফলে আমরা বুঝিয়াছি এই যে, প্রাচ্যভারতের অন্তর্নিষ্ঠ ভাব এবং পাশ্চাত্যদিগের বহির্নিষ্ঠ ভাবই এই প্রভেদের প্রধান

* সংবাদপত্রে (Musical Opinion—1925 বা Jan 1926 to March 1926'র issue'র ভিতরে) দেখিলাম যে, জর্ম্মাণীতে এক ব্যক্তি এক পিয়ানো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রুতিসমূহ নাকি প্রকাশ করা যায়। আমাদের কিন্তু ইহা বিশ্বাস হয় না। সেই পিয়ানোতে নাকি কোন গীত স্বরসম্বদ্ধ বা harmonised করিয়া বাজান হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ ভাবিয়াছিলেন যে, বাদক বুঝি ইচ্ছা করিয়াই ভুল বাজাইয়াছিলেন।

কারণ। ভারতের উষ্ণপ্রধান ভাব, ভারতের মাটির উর্ব্বরতা, ভারতের মলয় বায়ু, শত শত নদীনির্ঝরিণীর কুলুকুলু গান, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যচন্দ্রের উদয়াস্তের সঙ্গে শতবিধ বিহগের শতবিধ কলতান, এ সমস্তই ভারতবাসীকে ভগবৎবিধানে সেই আদিমকাল অবধি অন্তর্নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহারই ফলে ভারতবাসীর জীবনের সকল বিভাগেরই ভিতর দিয়া, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ভিতর দিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগের ভাব যেন ফুটিয়া উঠিতে চায়। ইহারই ফলে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মসাহিত্য ভারতবাসীর অন্তরে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই কারণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের অসদ্ভাব না থাকিলেও নিঃসঙ্গ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এই কারণেই যে রাগরাগিণীর আকারে সঙ্গীত নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুচারুরূপে গাহিতে পারা যায়, সেই আকারই এদেশে সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে। বৈদিক ঋষি প্রাণের সরল ভাষায় বলিয়াছেন যে, এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। প্রকৃত প্রাচ্যসঙ্গীতে ঋষির এই কথাই তানলয় সংযোগে ধ্বনিত হইতে চায়।

পাশ্চাত্যসঙ্গীত ও স্বরসম্বাদ।

ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শীতপ্রধান ভাব, তথাকার ভূমির উর্ব্বরতাসম্পাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শীতবায়ু বহমান হইবার কারণে গৃহ মধ্যে বদ্ধ থাকার আবশ্যকতা, অধিকাংশ সময়ে সূর্য্যচন্দ্রের উদয়াস্ত দেখিতে না পাওয়া, বিহগগীতের অভাব, এ সমস্তই ভগবৎবিধানে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আবির্ভাব অবধি পাশ্চাত্যবাসীকে বহির্নিষ্ঠ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে; পাশ্চাত্যবাসীর প্রাণ অধিকাংশ সময়ে বাহিরে ছুটিয়া গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিতে চায়। ইহারই ফলে, পাশ্চাত্যদিগের জীবনের সকল বিভাগেরই ভিতর দিয়া, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যোগের পরিবর্ত্তে জনসাধারণের পরস্পরের যোগের কথাই ফুটিয়া উঠিতে চায়। প্রাচ্যভারতে ভগবৎপ্রীতিই কেন্দ্র এবং মানবপ্রীতি পরিধিরূপে গৃহীত হয়। পাশ্চাত্যদেশে লোকে মানবপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া ভগবৎপ্রীতিতে উঠিতে চায়। ইহারই ফলে সেখানে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানই জনসাধারণের অন্তর সমধিক অধিকার করিয়া আছে। সেখানে নিঃসঙ্গ ভাবের অসদ্ভাব না থাকিলেও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এবং সেই কারণেই যে স্বরসম্বাদ বা হার্মনির আকারে সঙ্গীত সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় গাইতে পারা যায়, সেই স্বরসম্বাদের আকারই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বাধীনতা।

ভগবান প্রাচ্য সঙ্গীতের মূল কেন্দ্র বলিয়া, অন্তর্নিষ্ঠ ভাব উহার মূল প্রাণ বলিয়া, প্রাচ্যসঙ্গীত ভগবানের এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এবং ভগবন্নিহিত মানবাত্মার বিচিত্র কর্ম্ম ও ভাবের সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিবার অধিকার রাখে। প্রাচ্যবাসী যখন মুক্ত গগনের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করে এবং অগণিত গ্রহ-তারকার, অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের ছন্দে ছন্দে উদয়াস্ত দর্শন করে; যখন সে কনকতপনকে মহাসাগরের কুক্ষিভেদ করিয়া অরুণাচল হইতে উদিত হইতে এবং সন্ধ্যাকালে সকলের অজানিত নীরবে পূরবী রাগিণী গাইতে গাইতে অস্তাচলে অস্তমিত হইতে দেখে; যখন সে ছয় ঋতুকে ভগবানের আদেশে নির্দ্দিষ্টরূপে মানবের মঙ্গলসাধনে নিরত দেখে, তখন তাহার হৃদয় কি একঘেয়ে কোন একটি সুরে বা তালে আবদ্ধ থাকিতে পারে? তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতের শতবিধ বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শতবিধ গন্ধে ভরিয়া যায় এবং শতবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই কারণেই ভারতের সঙ্গীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ও তাহাদেরই বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপন্ন শতবিধ সুর এবং শতবিধ তাল দৃষ্ট হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচ্যসঙ্গীতের এই ভাবটি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিলে, এই শতবিধ সুর ও তালেই আমরা সঙ্গীতের বন্ধনের পরিবর্ত্তে প্রকৃত মুক্তিই দেখিতে পাইব। এই মুক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, উদ্দাম মুক্তি নয়। যে বন্ধন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী আনয়ন করে, সেই সর্ব্বাঙ্গীন বন্ধনকে পরিহার করিতে চাহিলেও, এই মুক্তি যথাযথ বন্ধনকে পরিত্যাগ করিতে চায় না। ইহা সর্ব্বতোবন্ধন ও উদ্দাম মুক্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সামঞ্জস্যের পথে থাকিয়া সঙ্গীতের নিত্যনব রসধারা বিকশিত করিবার অধিকার চায় ও রাখে। এই প্রকার মুক্তিই ভারতীয় সঙ্গীতকে স্বাধীনতার বিমল আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার সামঞ্জস্যের উপর চলিতেন বলিয়াই এদেশে সঙ্গীতঋষিগণ প্রয়োজনমত নূতন নূতন বিধিবিধান প্রণয়নে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

বিধিনিষেধের সঙ্গতি।

রবিশশী গ্রহতারা যে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবঋতু, নিত্য নব পুষ্পপত্রের জন্মদান করিয়া

নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ছন্দের সঙ্গে প্রাচ্যসঙ্গীতের রাগরাগিণী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার কারণে, ঋষিরা ধ্যানস্থ দৃষ্টিতে যে রাগ-রাগিণীকে যে সময়ে যে অবস্থায় গীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিধি দিয়াছেন, সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় সেই রাগ-রাগিণী গান করাই বিহিত, এবং বিরুদ্ধ রাগ-রাগিণী গান করা অবিহিত বলিয়া প্রাচ্যসঙ্গীতনায়কেরা মনে করেন। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময়ে যদি পূরবী রাগিণী গীত হয়, অথবা পূরবী রাগিণী ও চৌতালের সাহায্যে যদি আমাদের চঞ্চল ভাব প্রকাশ কবিবার চেষ্টা করা যায়; আর ভৈরোঁ রাগের দ্বারা যদি সন্ধ্যার ভাব, অথবা ভৈরবী রাগিণী ও ঠুংরী বা খেমটা তালের সাহায্যে দুঃখের মর্ম্মভেদী আকুলতা ব্যক্ত করিতে যাওয়া যায়, তবেই ঋষিদের বিধিনিষেধের সঙ্গতি উপলব্ধ হইবে।* সমাজ রক্ষা করিতে গেলে, ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করে বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তিকে যেমন শাস্তিযোগ্য বলিয়া স্থির করিতে হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গীতেরও প্রকৃতি সুরক্ষিত করিবার জন্যই ঋষিরা দেশকালঅবস্থাবিশেষে যথাসঙ্গত বিধি-নিষেধের বন্ধন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ বিধিনিষেধের বিধান দিয়াছেন বলিয়াই যে ঋষিরা গায়কদিগের স্বাধীনতার হস্তপদ সম্পূর্ণ বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা প্রয়োজনমত রঙ্গভূমিতে বা রাজ-সভা প্রভৃতি স্থলে রাজাজ্ঞা প্রভৃতি কারণে বিনা কালবিচারে সকল রাগ-রাগিণীই গাইবার বিধান দিয়া স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। স্বাধীনভাবে গাইবার অনুকূল অনেক বিধিবিধান আমাদের শাস্ত্রে আছে দেখা যায়।

শ্রুতির উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের তত্ত্বটী শাস্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচ্য সঙ্গীতের তত্ত্বানুসন্ধায়ী অনেক প্রতীচ্য সঙ্গীতবিৎ তাহা নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই ইহার মূলগত ভাবটী প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাগরাগিণী গাইবার বিষয় লইয়া এক আধটুকু উপহাস করিতেও বিরত হন নাই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা ও অভি-রুচিমত তথাকথিত প্রাচ্য সঙ্গীতের দুই-চারিটী তান-মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া তাহাকেই প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীতের আদর্শরূপে দাঁড় করাইতে চান। কাজেই তাঁহারা ঐপ্রকার বিধিনিষেধ নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, অপরকেও বুঝাইতে অসমর্থ হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিশুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্য ঢঙে কাটাছাঁটা আকারে অনুবাদ করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। যথা-সময়ে ও যথাস্থানে শ্রুতিগুলি যথাযথরূপে প্রকাশ করিবার উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

ধর্ম্মসঙ্গীতেই প্রাচ্যসঙ্গীতের বিকাশ ও পরিসমাপ্তি।

প্রাচ্যসঙ্গীত মূলতঃ ভগবৎকেন্দ্রক এবং সেই সূত্রে উহা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপর গ্রথিত বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতেই উহার প্রধান বিকাশ ও পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। ইউরোপেও গ্রীকদিগের দেবদেবীর পূজা উপ-লক্ষেই সঙ্গীতের প্রসারের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে গির্জ্জায় উহা বিশেষ স্থানলাভ করিলেও নানা কারণে ধর্ম্মেতে পরিসমাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশে ধর্ম্মেতে সঙ্গীতের বিকাশ ও পরিসমাপ্তির কারণেই ঋষিরা সঙ্গীতকে নাদব্রহ্মরূপে অভিহিত করিয়া উহাকে মুক্তিলাভের সহজ ও সুগম সাধন বলিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই ভগবানের পূজার জন্য রচিত সামগানেই প্রাচ্য সঙ্গীতের আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, প্রকৃত সামগানের ন্যায় মধুর গান তিনি জীবনে শ্রবণ করেন নাই।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বহির্নিষ্ঠতা।

বহির্নিষ্ঠতা পাশ্চাত্যসঙ্গীতের মূলপ্রাণ বলিয়া, উহা সকল সঙ্গীতের মূল উৎস ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারে নাই। তাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বজগতের—প্রকৃতির সর্ব্বত্র অনুপ্রবাহিত রসস্রোতের পরিবর্ত্তে ব্যক্তি-গত ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এখন মোটামুটি দেখা যায় যে, কোন এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মনের ভাব সাধারণতঃ প্রায় একই ধাঁচে বা আদর্শে সংগঠিত হয়। বলা বাহুল্য, মাত্র ব্যক্তিগত ভাবের উপর প্রধানত যে সঙ্গীত গ্রথিত, সে সঙ্গীত সহজে গগন-

* প্রতীচ্য সঙ্গীতে সান্ধ্যগীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেও এইপ্রকার বিধিনিষেধের সঙ্গতি স্পষ্ট বোঝা যাইবে। এই সকল সান্ধ্যগীতি প্রভাতে গান করা হয় না, এবং করিলেও কানে নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকে। রসিমি একবার কৌতুকছলে হর্ষ ব্যক্ত করিবার স্থলে বিষাদগীত এবং বিষাদের স্থানে হর্ষগীতি কোনও রঙ্গমঞ্চে করাইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রহৃত হইতে হইতে কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

স্পর্শী উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না। বেশ একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই কারণে ধরণধারণ তাল ও রচনাপ্রণালী বিষয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে মোটামুটি একই আকারপ্রকার দৃষ্ট হয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য স্পর্শ স্বভাবত থাকিতে বাধ্য হইলেও উহাতে বিশ্বপ্রকৃতির শতবিধ ছন্দ ও সুর অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ সাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে তাঁহার রচিত সঙ্গীতও অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতাগণের যিনি যত উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতে ততই প্রাচ্য সঙ্গীতের অনুরূপ রাগরাগিণীরই প্রাধান্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক্ স্পর্শ থাকে না বলিয়া উহা দেশ-কাল-অবস্থা-নির্ব্বিশেষে গাইলে বিশেষ দোষাবহ মনে হয় না। পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী নয় বলিয়াই পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না যে, মল্লার গাওয়ার সঙ্গে মেঘ হওয়া ও বারিবর্ষণের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথবা দীপক রাগের সঙ্গেই বা বিশ্বদহনের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহা তো জানা কথা যে, এক শ্রেণীর শিকারী বিভিন্নজাতীয় পক্ষীর কণ্ঠস্বরের অবিকল নকল করে, এবং জাল পাতিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন সেই সকল বিভিন্নজাতীয় পক্ষীরা ঐ সকল কণ্ঠস্বরের প্রত্যুত্তরে ঝুপঝাপ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসে। ইহাও তো এক পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিবিশেষ উৎপাদন করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। সেইরূপ ভারতের সঙ্গীত-ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে মল্লার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রাগিণীর সহিত প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার যোগ যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ রাগিণী গাইয়া প্রকৃতি হইতে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাড়া পাইতেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আজ তাহা আমাদের নিকট উপহাসের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু দুইদিন পরে উহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সঙ্গীতঋষিগণের উদারতা।

ভারতের ঋষিগণ সঙ্গীতে কেবল যে স্বাধীনতা ও প্রকৃতির অনুসরণ বা স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল—তাঁহারা নিজেদের প্রচারিত সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য সঙ্গীতকেও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের উদার হৃদয়ের কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। কিন্তু সেটী ভুলিলে চলিবে না; তাহা হইলে আমরা কোন বিষয়েই ভারতের ইতিহাসের ধারা বুঝিতে পারিব না। সমাজের দুই-একটী কঠোর বিধিনিষেধের বিধান বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়া ঋষিদিগকে অনুদার বলিয়া ছাপ মারিলে কেবল তাঁহাদের উপর নহে, নিজেদের উপর অন্যায় করা হইবে। তাঁহাদের প্রচারিত বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করিলে তাঁহাদের অনুপম উদারতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। তাঁহাদের উদারতা কেবল সামাজিক বিধিনিষেধেই ব্যক্ত হয় নাই; সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকলা সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট উদারতা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যখন ভগবানকে সঙ্গীতের কেন্দ্র করিয়া প্রকৃতিরই অনুগামী হইয়া বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিধিনিবদ্ধ সঙ্গীতের ন্যায় জনপ্রিয় কৃষাণগীত প্রভৃতিকেও সঙ্গীতের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য। বস্তুতই দেখি যে, তাঁহারা ঐ সমস্ত সঙ্গীতকে 'দেশী' নামে গ্রহণ করিয়াছেন—গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের প্রতি এখন যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমুত্থিত হইতেছে, তাহা সমুত্থিত হইত কিনা সন্দেহ। সভ্যতার কঠিন আঘাতে প্রাণের সরল ও সরস ভাব যেখানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় নাই,—সেখানেই জনপ্রিয় স্বভাবজাত 'দেশী' সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। এই দেশী গীতের সাহায্যেই মানবমাত্রেই সদ্য সদ্য সমুত্থিত প্রেম, হর্ষ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। তাই কোন দেশেই জনপ্রিয় 'দেশী' গীতের বিশেষ অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদ প্রভৃতিকে 'কৃষাণগীতি' বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের দেশী কৃষাণগীতের মধ্যে নিধুবাবুর টপ্পা, বাউলগীত, কীর্ত্তন, সারিগান প্রভৃতি সমাবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল দেশী গানের অনেক শ্রেণী সভ্যতার অগ্রগমনের সম্মুখে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের মতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও পূর্ব্বের ন্যায় আজকাল খাঁটি দেশী কৃষাণগীতি নাকি শুনিতে পাওয়া যায় না। জগতে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ন্যায় জাতিসমূহের ও সমাজসমূহেরও সহজাত ভাবোচ্ছ্বাস সদ্য সদ্য বাহিরে প্রকাশ করিবার ভাব স্বভাবতই অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও ভিতর যেটুকু জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতেছে, তদনুপাতেই তাহারা প্রাণের কথা সরল ভাষা ও সরল সুরের সরল গাথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে এবং স্বতউত্থিত ভাবসমূহকে অস্বাভাবিক ভাবে চাপা দিতে শিখিতেছে।

জাতির যে অন্তঃস্ফূর্ত্তির ভিতর দিয়া কৃষাণগীত ফুটিয়া উঠে, বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার গুণে সেই অন্তঃস্ফূর্ত্তি ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে জগতে এই অন্তঃস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া বড়ই দুর্লভ। তাহার কারণ এই যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রাণ হইল—পরস্পরকে প্রতিপদে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া নিজের আসন অধিকার করা; যাহার প্রধান মন্ত্র হইল স্বার্থপরতা ও আত্মগোপন, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আজ সমগ্র জগতকে আয়ত্ত করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। যে মুক্ত বিকাশের ভাব আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত করে, সে ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। সেই কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে জগতে জালাযন্ত্রণারই বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকৃত অন্তঃস্ফূর্ত্তি জাগ্রত হইবার অবসর পাইতেছে না।

ভারতীয় সঙ্গীত ও সামঞ্জস্য।

জনপ্রিয় দেশী কৃষাণগীত সহসা সমুত্থিত ও সহজ ভাবোচ্ছ্বাসের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া সহজ সুরের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। আর, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের ভিত্তি হইল সঙ্গীতবিজ্ঞান—ইহা সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর সংস্থাপিত; সেই সকল নিয়ম জ্ঞানসংযোগে আলোচিত হইয়া বিশুদ্ধ সঙ্গীতরচনায় প্রযুক্ত হয়। ভারত যেমন দেশবিদেশের লোককে অকুতোভয়ে আশ্রয় প্রদান করিতে দ্বিধা করে নাই, ভারতের মূল সার সত্যধর্ম্মে যেমন সকল ধর্ম্মের সহজ সমাবেশ হয়, সেইরূপ ভারতের সঙ্গীতেও দেশী বা বিজ্ঞানসিদ্ধ, সকল প্রকার সঙ্গীতই সমাবেশ লাভ করিয়াছে। কেবল এদেশেরই বিশুদ্ধ ও দেশী নহে, কিন্তু ভারতের সঙ্গীতে দেশবিদেশের ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে অভিব্যক্ত সঙ্গীতেরও সমাবেশ হইতে দেওয়া উচিত। এই ব্রহ্মচক্র বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে, সজীব রহিয়াছে। সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রকৃতপক্ষে সজীব রাখিতে চাহিলে, বিশ্বজয়ী শক্তিরূপে দাঁড় করাইতে চাহিলে, বিধিনিষেধের নিয়ম ও স্বাধীনতার মুক্তভাব, এই উভয়ের সামঞ্জস্যজনিত সংযত স্বাধীনতার উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং সভ্য-অসভ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতির, সকল দেশের সঙ্গীতকে তাহার ক্রোড়ে সাদরে স্থান দেওয়াইতে হইবে; ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী বা বিদেশীয় স্বরসম্বাদের সাহায্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা প্রবলভাবে জাগরূক থাকাতে, ভগবদ্ভক্তি তাহার সকল কার্য্যের মূলকেন্দ্রে থাকাতে, ভারতের প্রাচীন বিশুদ্ধ সঙ্গীত যথাসম্ভব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্ত সজীব থাকিতে পারিয়াছে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই কারণে ভারতে জ্ঞানচর্চ্চা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিলেও তাহা শতসহস্র বিপ্লবের ভিতরেও জাতীয় প্রাণের অন্তঃস্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারে নাই। এখানে, কি বিশুদ্ধ সঙ্গীত, কি কৃষাণসঙ্গীত, কোন সঙ্গীতই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দণ্ডায়মান নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সঙ্গীত সাধারণতঃ আমোদপ্রমোদেরই একটা অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু এদেশে সঙ্গীত কেবল কলাকৌশল নয়, কেবল বাহার দিবার জিনিস নয়। নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেমন জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, এদেশে সঙ্গীতও সেইরূপ লোকের প্রাণ—অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাহার কারণ, যে ভগবান প্রতি অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, আমাদের দেশে সঙ্গীত সেই ভগবানেই পর্য্যবসিত বলিয়া স্বীকৃত হয়; ইহা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্যতর উৎকৃষ্ট সাধনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই সঙ্গীত প্রাচ্যবাসীকে পরাধীনতার কঠোর নিষ্পেষণের মধ্যেও সজীব রাখিতে পারিয়াছে, আনন্দস্বরূপের অন্ততঃ কণামাত্র আনন্দও উপলব্ধি করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে।

আমার প্রাণে প্রাচ্য সঙ্গীতের যে বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহাই আমি সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্মুখে সসঙ্কোচে উপস্থিত করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ নিউটনের পদানুসরণ করিয়া আমিও বলিতেছি যে, প্রাচ্য সঙ্গীতের মহাসাগরের তীরে বসিয়া দুই চারিটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। কোথায় বা তানসেন সদারঙ্গ, কোথায় বা ভক্তিমতী মীরাবাই, আর কোথায় বা আমার মত ব্যক্তি! তথাপি ভগবানের করুণাস্বরূপে যে বাণী আমার প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা সকলের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই প্রাচ্য সঙ্গীতের সেই বাণী বোধ হয় পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই বাণীর একটি কথা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে স্বাধীন ভাব খেলিবার অবসর দিতে হইবে। সঙ্গীতকে আটেঘাটে বিধিনিষেধের নিশ্বাসরোধকর জালে বাঁধিয়া মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলে চলিবে না; বিধিনিষেধের সঙ্গে তাহাকে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করাইতে হইবে। সঙ্গীতকে একদিকে উচ্ছৃঙ্খল মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, অপরদিকে বিধিনিষেধের নিষ্পেষণে তাহাকে বাঁধিয়া মারিলে চলিবে না—তাহাকে সামঞ্জস্যের পথে, সংযত স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে উদারতার উপর দাঁড় করাইতে হইবে। সত্যধর্ম্ম যেমন আস্তিক বা নাস্তিক, কাহাকেও

স্বীয় আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না, সেইরূপ ভারতের সত্য সঙ্গীতও শাস্ত্রীয় বা 'দেশী', এদেশীয় বা বিদেশীয়, কোন সঙ্গীতকেই অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন না। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন অপর দেশের জ্যোতিষ গৃহীত হইবার ফলে তাহার উন্নতি-সাধনই হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের উন্নতি-সাধনে ইচ্ছা করিলে সঙ্গীতকে তাহার মূল প্রকৃতি অসাম্প্রদায়িকতার উপর দাঁড় করাইতে হইবে, তাহার উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব রক্ষা করিতে হইবে; দেশ-বিদেশের সঙ্গীতকে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার সার্ব্বজনীন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর শেষ কথা এই যে, সঙ্গীতকে যেমন স্বাধীনতা দিতে হইবে, যেমন তাহাকে উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে, সেইরূপ তাহার স্বাভাবিক ভাবও বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বাভাবিকতা হইতেই প্রাচ্য সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন রাগরাগিণীরও উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাগ-রাগিণী গাইবারও রীতি প্রচলিত হইয়াছে। শতবিধ বৈচিত্র্যের উৎস স্বাভাবিকতা হইতে সঙ্গীতকে বিচ্যুত করিলে সঙ্গীত জড়প্রায় হইয়া পড়িবে; তখন তাহাকে অকালমৃত্যু হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, সে সঙ্গীত ভারতবাসীকে সঞ্জীবনী শক্তিতে জাগাইতে পারিবে না।

সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী অন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য সঙ্গীতকে কেবল এক দেশে নয়, কেবল এক জাতির মধ্যে নয়, কিন্তু সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে জয়যুক্ত করুন। ভগবানের চরণে আমার এই প্রার্থনা—পুরাকালের ন্যায় আজ আবার ভারতীয় সঙ্গীতের চরণে জগতের মস্তক অবনত হউক; ভারতীয় সঙ্গীত আবার সকলের অন্তরে মুক্তির দীপ্তদীপ প্রজ্বলিত করুক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

পত্নীবিয়োগ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি রমণীয় গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন এবং যদিও পরিবারস্থা অন্যান্য মহিলাগণের ন্যায় তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবা দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বর্ণকুমারী বলেন, তিনি প্রায় তাঁহার সমবয়স্কা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সাহিত্যানুরাগ এই প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় পরিবারস্থ সকলেই নিরতিশয় ব্যথিত হন। প্রিয়তমা পত্নীর অকালবিয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। (এই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ "ভারতী"র সম্পাদন-ভার স্বর্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করেন)।

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে এই গভীর দুঃখ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার একজন বন্ধু বলেন যে, এরূপ অবস্থায় সচরাচর লোকে হয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চিরজীবন বিষণ্ণভাবে অতিবাহিত করে, নতুবা চরিত্রভ্রষ্ট হয়। নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন ৩৭ বৎসর মাত্র। তাহার পর তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিনও ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া বিষাদে আচ্ছন্ন হন নাই। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ সাধকগণের ন্যায় নিমগ্ন থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং সকলকে উপভোগ করাইতেন। বার্দ্ধক্যেও তিনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন এবং আনন্দের সহিত বালক-বালিকাগণের শিশুসুলভ ক্রীড়া ও গানে যোগদান করিতেন। তাঁহার আনন্দপূর্ণ আনন দেখিলে মনে হইত তিনিই যথার্থ আনন্দময়ের উপাসক।

সাধনা। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত মাসিক পত্র "সাধনার" প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসর এই মাসিক পত্র বঙ্গবাসীকে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করিয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকগণের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই মাসিকপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি", "লোকচেনা" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ আলোচনা করেন নাই।

চিত্রাঙ্কন। এই সময় হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার খাতায় অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। রাজা মহারাজা হইতে পাখা টানা কুলীও তাঁহার খাতায়

সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম্ রদেনষ্টাইন্ তাঁহার কয়েকটি চিত্র দেখিয়া মোহিত হন এবং তাঁহারই অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতকগুলি চিত্র মুদ্রিত করিবার অনুমতি দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই চিত্রপুস্তকের ভূমিকায় রদেনষ্টাইন্ যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে কতকগুলি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম—সে চিত্রগুলিতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। গত বৎসর যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে পারি যে, চিত্রগুলি তাঁহারই এক সহোদরের অঙ্কিত। তিনি কতকগুলি মূল চিত্রের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখেন এবং আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার কয়েকখানি ছবির খাতা প্রাপ্ত হই। চিত্রাঙ্কন ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবসায় নহে। নিজের অনুরাগ বশতঃ ও আনন্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এবং সখের চিত্রকরগণের নিকট আমরা যে একাগ্রতা ও যথার্থতা আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই গুণগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কিত মুখগুলিতে এমন একটি আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার আরও বোধ হয় চিত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ বা মোগল আদর্শের অনুসরণের জ্ঞানকৃত চেষ্টা নাই। ভারতীয় মহিলাগণের চিত্রগুলি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় চিত্রকরগণ নারীসৌন্দর্য্যের এরূপ ম্লান ও চেতনাহীন কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, আলোচ্য চিত্রগুলির ন্যায় স্বাভাবিক ও প্রাণময় চিত্রের জন্য ডুয়ার ও হলবীনের যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। চিত্রগুলিতে জীবনের পরিদৃশ্যমান অপূর্ব্ব বিচিত্রতা ও মনোহারিতা লক্ষ্য করিয়া আমি একটি কথা বুঝিতে পারি না যে, কেন ভারতবর্ষের নবীন যুগের চিত্রকরগণ মোগল ও রাজপুত আদর্শ হইতে বিষয় এবং অঙ্কনপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন।

"আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি ক্ষণস্থায়ী রূপভেদ বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় অপকৃষ্ট শিল্পের অনুকরণ এবং তুচ্ছ ও নীরস বিষয়ের অনুসরণের প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করিবার প্রশংসনীয় অভিপ্রায়ই ইহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্পে উচ্চশ্রেণীর চিত্রাঙ্কন এবং মহতী কল্পনারও অভাব নাই এবং ইহাদের প্রভাবও বোধ হয় অপকারী নহে, যদিও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ চিত্রের নিদর্শন অল্পই আমদানী হইয়াছে। কোন বিজাতীয় পদ্ধতির জ্ঞানকৃত অনুকরণে কোনও সজীব চিত্রকরসম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব বটে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পুরাতন পদ্ধতির অনুকরণের দ্বারাও এরূপ সম্প্রদায়কে জীবনদান করা যায় না। অনুকরণ দ্বারা নূতন শিল্পপদ্ধতির সৃষ্টি হয় না,—উহার উৎপত্তি চিত্তের আবেগময়ী কল্পনায়। ভাবের চাষ হইতেই শিল্পের উৎপত্তি, এবং সাধারণ কৃষিকর্ম্মের ন্যায় ইহাতেও অসীম পরিশ্রম, নিপুণতা, ধৈর্য্য এবং অদম্য অধ্যবসায়ের আবশ্যক এবং ইহা ব্যতীত সরস ও স্বাস্থ্যকর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রসমূহে আমি এই আবেগময়ী কল্পনার আভাস দেখিতে পাই। ইহা অতি সরল ও আড়ম্বরবিহীন; কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহার চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার মুখাকৃতির কমনীয়তা ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছায় তিনি প্রণোদিত ছিলেন।

"আমরা সচরাচর রাজা মহারাজাদিগের রাজবেশপরিহিত চিত্র কিম্বা ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক পুস্তকে অদ্ভুত রকমের আলোকচিত্র দেখিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে এই সকল সুশিক্ষিত ভারতীয় মহিলা ও ভদ্রব্যক্তিগণের (যাঁহাদের বিষয় আমরা ইংলণ্ডে অল্পই শুনিতে পাই বা জানিতে পারি) চিত্রদর্শন অত্যন্ত অভিনব ও আনন্দজনক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অঙ্কিত ২৫ খানি চিত্রের প্রতিলিপি মিঃ এমেরি ওয়াকার দ্বারা প্রস্তুত করাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, এই সকল চিত্র হইতেও আমরা অনেকেই সেইরূপ পরিচয় পাইতে পারি।

"আমি আধুনিক প্রতিকৃতি অতি অল্পই দেখিয়াছি যাহাতে এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। আশা করি উহা হইতে পাঠকগণ উইলিয়াম রদেনষ্টাইনের উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

'হিতে বিপরীত।'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুকাল নাটক-প্রহসনাদি রচনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। একদিন মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহাকে বলেন, "তুমি অনেকদিন নাটক

রচনা কর নাই—একখানি নাটক লেখ।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং যতক্ষণ নাটক লেখা শেষ না হয় ততক্ষণ মুক্তি প্রদান করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে দায়ে পড়িয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষুদ্র নাটিকা 'হিতে বিপরীত' লিখিতে বাধ্য হন। এই নাটিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ ১৭ই বৈশাখ) প্রকাশিত হয় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সহিত ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর শুভ বিবাহোপলক্ষে নাতিনীকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। উৎসর্গ-পত্রটী এইরূপ:—

নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার
নলিনি, জুটল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর,
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

এই নাটিকাখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে ও সঙ্গীত-সমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

'স্বরলিপি' 'গীতিমালা' ও 'বীণাবাদিনী'।'—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামক বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতাদিগের সাহায্যে 'স্বরলিপি গীতি-মালা' নামক এক স্বরলিপি-সম্বলিত ১৬৮টী বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে 'সংখ্যামাত্রিক' স্বরলিপির পরিবর্ত্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি ব্যবহৃত হয়। উক্ত ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষমহাশয় এই সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম জ্যোতিবাবুর সহিত পরিচিত হই। আমি তখন সবে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আমার পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তখন আমাদের দোকান ২৬৭ বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। জ্যোতিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমার পিতা বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন—কারণ তখন "স্বরলিপি-গীতি-মালা" যন্ত্রস্থ। পিতৃদেব উক্ত পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং জ্যোতিবাবু স্বাভাবিক মহত্ত্বসহকারে উহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। "সাধনা" মাসিকপত্রে জ্যোতিবাবু যে 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি'র প্রবর্ত্তন করেন, সেই পদ্ধতি গ্রন্থে অবলম্বিত হয়। 'স্বরলিপি-গীতিমালা' দ্বারা আকারমাত্রিক স্বরলিপির বহুল প্রচার হয়। এই নূতন স্বরলিপি-পদ্ধতি সঙ্গীত ও বাদ্যশিক্ষা সরল ও সহজ করিয়াছে। ইহার আর একটি গুণ এই যে, সচরাচর মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল অক্ষর বা চিহ্ন থাকে তাহা দ্বারাই স্বরলিপি মুদ্রিত করা যাইতে পারে। গানের স্বরলিপি রীতিমত প্রকাশ করা আজি কালি প্রায় সকল বাঙ্গলা মাসিক পত্রেরই অঙ্গ হইয়াছে। জ্যোতিবাবু এই স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত না করিলে ইহা সম্ভব হইত না।"

'স্বরলিপি-গীতি-মালা' ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে (১৩০৪ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। এদেশে সঙ্গীতবিদ্যা বিস্তারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতদূর আগ্রহশীল ছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থে শিক্ষার্থীর প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন হইতে দুইটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যদি কোন শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোন অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোন গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।"

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্'এর সাহায্যে সঙ্গীত ও স্বরলিপি-প্রকাশিনী একটি মাসিক পত্রিকা—'বীণাবাদিনী' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"স্বরলিপি-গীতি মালা প্রকাশের অল্পদিন পরেই জ্যোতিবাবু ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার বিস্তার কল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার কল্পনা করিলেন। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন এবং উহা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ক্ষতি স্বীকার করিতেও সম্মত হইলেন। ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'বীণাবাদিনী' নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সঙ্গীতসম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ ব্যতীত 'বীণাবাদিনী'তে বহু নূতন ও পুরাতন সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তনের দুই বৎসর পরে রহিত হয়; কারণ,

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সমাজের মুখপত্র স্বরূপ 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

"জ্যোতিবাবু 'বীণাবাদিনী'র প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বহু স্বরলিপি ও মন্তব্যাদি লিখিতেন, অন্যান্য লেখক-লেখিকাদিগের নিকট হইতে রচনা সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং প্রুফ দেখিতেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, বন্ধুদিগের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য আদায় করিয়া দিতেন। তখন তিনি বালীগঞ্জে থাকিতেন, কিন্তু প্রত্যহ 'বীণাবাদিনী' যেখানে মুদ্রিত হইত সেই ভারতমিহির প্রেসে স্বয়ং গিয়া কম্পোজিটর দিগকে উপদেশ দিতেন বা প্রুফ সংশোধন করিয়া দিতেন।

"জ্যোতিবাবু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার ও এস্রাজ বড় ভালবাসিতেন। তিনি আমাদিগকে এই যন্ত্রদ্বয় নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের জন্য প্রায়ই অনুরোধ করিতেন এবং যখন আমরা এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করি তখন তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

'ভারত-সঙ্গীত সমাজ'। পুণায় অবস্থান-কালে তত্রত্য 'গায়ন সমাজ' দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'সঙ্গীত-সমাজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু সঙ্গীতানুরাগী ভদ্রমহোদয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সাধু সংকল্পে যোগদান করেন এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে "ভারতসঙ্গীত-সমাজ" সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এই সমাজপ্রতিষ্ঠার সংকল্প জ্ঞাত করাইলে তিনি এক সহস্র টাকা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন। ঠাকুরপরিবার হইতে আরও সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অভিজাতগণ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর বলেন, এই সমাজপ্রতিষ্ঠার কল্পনার জন্যই কেবল সঙ্গীতসমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট ঋণী নহে, প্রথম অবস্থায় ইহার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক-একদিন রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত তিনি সমাজগৃহে থাকিয়া অভিনয় ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়াইতে পারিত না। সমাজপ্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই সঙ্গীতসমাজের কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ ঘটে। এমন কি, ইহা লইয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন সভ্যের সহযোগিতায় 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটী হইতে স্থানান্তরিত করেন। বিপক্ষগণ 'সঙ্গীতসমিতি' নাম দিয়া একটী সঙ্গীতসমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে স্থাপিত করেন। 'সঙ্গীতসমিতি' বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' এখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কীর্ত্তিমন্দির স্বরূপ বিরাজিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সঙ্গীতসমাজের প্রথম সম্পাদক। বহুদিন সম্পাদকের কার্য্য করিয়া অবশেষে তিনি উহার অন্যতম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীতসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' 'অলীকবাবু' 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। এইখানে অভিনয়ের জন্য তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন, যথা—পুনর্বসন্ত, বসন্তলীলা, ধ্যানভঙ্গ। ইহার মধ্যে পুনর্বসন্তগীতিনাট্যখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্বে একদা ষ্টীমারে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তদীয় অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কতকগুলি গান রচনা করেন এবং সেইগুলি সংযোজিত করিয়া যোড়াসাঁকোর বাটীতে অভিনয়ার্থ "মানভঞ্জ" নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। এই 'মানভঞ্জ'ই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পুনর্বসন্ত' রচিত হয়। 'পুনর্বসন্তে' মহাকবি সেক্সপিয়রের Midsummer Night's dream এর ছায়া লক্ষিত হয়।

এই "অদ্ভুত-রসামিশ্র গীতিনাট্যে" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নাটকীয় রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ কবির সুললিত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহার উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার গানগুলি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সুরগুলি এত মিষ্ট যে এই গীতিনাট্যখানি সে সময়ে সঙ্গীতানুরাগিগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ইমন পূরবী—দাদরা।

বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে।
দিবানিশি একা বসি আঁধার ঘরে শূন্য হিয়ে ॥
কবে হবে পূর্ণ আশা সার্থ হবে ভালবাসা
ভেসে যাবে উছল প্রেমে হৃদয়তীরে জননী হে।
কত লোকে তো যায় মা চলে
চায় নাকো কেও বারেক ফিরে—
পথের ধারে কে কোথা প'ড়ে,
মরণ-ছোঁয়া কে বা ছেলে
তারেও তুমি যাওনা ভুলে
তারেও তুমি লও মা তুলে আদর করে জননী হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ° ১´ ° ১´
II গা গা -ঋা। ঋধা পাঃ -ঋাঃ I গা -া ঋা। গা ঋা -া I সা -া -া।
বে লা ° চ ° লে ° যা ° য় তো ° ° মা ° °

° ১´ ° ॥ ১´
। সঋা -সঋা -সন্‌া I -াঃ সঃ ঋা। গা -া -া [{ গঋা গঋপা -া।
পা° ° ° ° ° ° নে চে য়ে ° ° দি ° বা° ° °

° ১´ ° ১´
। পঋা ধপপা -া I পা ঋাপধপা ঋাপঃ° ঋা°। গমা গা -া } I গা ঋা -ঋধা।
নি ° শি ° ° ° এ কা° ° ° ° ° ° ব ° সি ° আঁ ধা র

° ১´ ° ১´
। পাঃ ঋাঃ গা I -া গঋা -গঋপা। ঋা গা -া I -ঋা -গা -ঋা I
ঘ ° রে ° শূ° ° ° ° ন্য হি ° ° ° °

°
। -া সা -া II
° য়ে °

১´ ° ১´ ° ১´
II গা গা -া। পা ধা -পা I র্গর্সা -া র্সা। র্সাঃ নঃ র্বর্সর্সা I -া -া -া।
ক বে ° হ বে ° পূ ° র্ণ আ ° শা° ° ° ° °

° ১´ ° ১´ °
। র্সা -া না I ধাঃ -ঋাঃ ধা। -া ধা না I ধনর্সনা -ধনা ধপা। ঃ -ঋাঃ -গা -া [
সা ° র্থ হ ° বে ° ভা ল বা° ° ° সা° ° ° ° °

১´ ° ১´ °
I { গঋা গঋপা -া। গঋা ধপা -া I ঋাপধা ধপাঃ ঋাঃ। গমা গা -া } I
ভে ° সে ° ° ° যা° বে ° উ ° ° ছ ল্ প্রে ° মে °

১´ • ১´ • ১´
I গা গাঃ মঃ | গা রা -গরা I সা সধ্া -সা | সরা -সরগমা -গরা I গা -া -া |
হৃ দ য়্ তী রে • • জ ন • • নী • • • • • • হে • •

•
| -া -া -া II
• • •

১´ • ১´ •
II গা -গা -মা | গা -া রা I সাঃ -ধ্ঃ সা | রা গা -া I
ক ত • লো ক্ ত বার্ • মা চ লে •

১´ • ১´ •
I গক্ষা -গক্ষপা পা | পক্ষা পা -া I ক্ষাপধা ধপাঃ ক্ষাঃ | গমা গা -া I
চা • • • য় না কো • কে ও বা • • রে ক্ ফি • রে •

১´ • ১´ • ১´
I গা গা ক্ষা | ক্ষধা পাঃ ক্ষাঃ I গা -া -মা | গা রা -গরা I -সা -ধ্া -সা |
প থে র্ ধা • রে • কে • • কো থা • • • • •

• ১´ •
| -রসা রা গা I -া -া -া | -া -া -া II
• • প ড়ে • • • • • •

১´ • ১´ • ১´
II গা গা -া | পা ধাঃ পঃ I পর্সা -া র্সনা | র্রর্সা র্সা -া I র্সা র্সা না |
ম র ণ্ ছোঁ য়া • কে • • বা • ছে লে • তা রে ও

• ১´ • ১´ •
| ধক্ষা ধা -া I ধনা -ধনর্সা না | ধনা ধপপাঃ -ক্ষাঃ I -গা -া -া | -া -া -া I
তু • মি • যা • • • ও না ভু • লে • • • • • • • • •

১´ • ১´ • ১´
I { গক্ষা পা -া | ক্ষা পা -া I ক্ষাপধনা -া ধা | পক্ষা গমা -গা I -া -া -া |
তা • রে ও তু মি • ন • • • ও মা ভু • লে • • • • •

• ১´ • ১´
| গা গাঃ মঃ I গা রা গরা | সা সধ্া সা I সরা -সরগমা গরা |
আ দ র্ ক রে • • জ ন • • নী • • • • • • •

•
| গা -া -া } II II
হে • •

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

সমস্ত কাঠিন্যটা দশম ও একাদশ কারিকা-দুইটার সহিত ১৮শ কারিকার সামঞ্জস্য দৃশ্যতঃ অসম্ভব হওয়াতেই উত্থিত হইয়াছে। সেই ১৮শ কারিকাটী এই—"জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব।" অর্থাৎ "জন্ম, মরণ ও করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়"। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই সূত্রটী পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং দৃশ্যতঃ ইহা ১০ম ও ১১শ কারিকার সহিত অসমঞ্জস; কারণ ঐ দুই কারিকার পুরুষ যে এক, এই কথা বলা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ এই অসামঞ্জস্য হইতেই ১৮শ কারিকাটীর অর্থ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে ১০ম ও ১১শ কারিকার সহিত ইহার অর্থের সামঞ্জস্য রহে। কিন্তু এইরূপ অর্থের পরিবর্ত্তন না করিয়া উহাদিগকে সমঞ্জস করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, কারিকাগুলি কি বাস্তবিকই অসমঞ্জস? আমার মতে নহে। ১০ম ও ১১শ কারিকায় পরমপুরুষের কথা বলা হইয়াছে এবং ১৮শ কারিকায় উপাধিযুক্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, সাংখ্য মাত্র পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকার করে এবং তাহার মধ্যে পুরুষ অন্যতম; সুতরাং সাংখ্যে কেবল একপ্রকার পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে, দুই প্রকার পুরুষের কথা নহে; এবং যে একপ্রকার পুরুষের কথা হইয়াছে তিনি অবশ্য ব্যক্তের সহিত যুক্ত, সুতরাং বহু। অবশ্য একথা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রে দুই প্রকার সূত্রে দুই প্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে—ঈশ্বর ও জীব। সাংখ্য-কারিকা সম্বন্ধেও তাহাই। একথা সত্য যে, সাংখ্য-কারিকার কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহার কারণ বোধ হয় এই যে 'ঈশ্বর' শব্দটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে; বিশেষতঃ শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' অর্থে 'ঈশ্বর' শব্দটীর ব্যবহার কোথাও হয় নাই; অথবা এই কারণেও হইতে পারে যে সাংখ্য-কারিকা, ঈশ্বর ও জীবের স্বভাবগত (essential) কোনও ভেদ স্বীকার করে না, কারণ জীব ঈশ্বরেরই প্রকাশ। কিন্তু কারণ যাহাই হউক্ না কেন, এ যুক্তিটী অবশ্য ঠিক নহে যে সাংখ্য-কারিকাতে 'ঈশ্বর'-শব্দটীর কোনও উল্লেখ না থাকায় একথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। আমি দেখাইব যে 'পুরুষ' বা 'আত্মা' অর্থে সাংখ্য-কারিকা কখনও ঈশ্বরকে কখনও বা জীবকে বুঝাইতেছে।

আমরা যদি ১৮শ কারিকাটীকে আর একটু যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহা বাস্তবিক প্রমাণিত হয় না। জন্ম, মরণ, ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও ত্রিগুণ—এ সকলই প্রকৃতির অথবা প্রকৃতি-তত্ত্বের ধর্ম্ম; ইহার কোনটাই পুরুষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ নিত্য ও অসীম হওয়াতে পুরুষের জন্ম বা মরণ হইতে পারে না; সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে কোনও ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না; নিষ্ক্রিয় হওয়াতে পুরুষ কার্য্য করিতে পারেন না এবং অখণ্ড ও নিরবয়ব বলিয়া তিনি গুণাতীত। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিধান বা নিয়ম, প্রবৃত্তির অযৌগপদ্য ও ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষবহুত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু উহা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া যে উপাধিগুলির মধ্য দিয়া সপ্রকাশ হয় তাহাই বহু। এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। মানুষের দুইটী দিক্ আছে—একটী চৈতন্যের দিক্ অপরটী জড়ের দিক্; অথবা সাংখ্যের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মানুষের একটী দিক্ আছে যাহা হইতেছে পুরুষ এবং অপর একটী দিক্ আছে, যাহা হইতেছে উপাধিরূপী প্রকৃতি; যথা—মহৎ অথবা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। মানুষ প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয় (synthesis)। মানুষের মধ্যে পুরুষই অসীম, অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ; কিন্তু তাহার প্রকৃতি বস্তুতঃ সসীম, পরিবর্ত্তনশীল, কালে আবদ্ধ, অসর্ব্বব্যাপী, ক্রিয়াশীল ও সঙ্গযুক্ত। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহারই ধর্ম্ম, আর তাহার মধ্যে যে পুরুষ আছেন—তিনি এ সকলের অতীত। কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ১৮শ কারিকা পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহে না (ইহা অসম্ভব), কিন্তু প্রকৃতির উপাধির বহুত্বই প্রতিপন্ন করিতে চাহে। অধিকন্তু ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, ১০ম ও ১১শ কারিকায় পুরুষের যে একত্বের কথা বলা হইয়াছে ১৮শ কারিকা পরোক্ষভাবে তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

কিন্তু এ প্রশ্ন এখনও হইতে পারে যে ১৮শ কারিকায় পুরুষের যে বহুত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত পুরুষের একত্ব কিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে? অথবা, পুরুষ কি করিয়া এককালে এক ও বহু হইতে পারেন? এই প্রশ্নটী দর্শনশাস্ত্রের একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং ইহাতে দর্শনের 'এক ও বহুর' প্রাচীন সমস্যা (The problem of the one and the many) উত্থিত হইতেছে। মানুষই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মানুষ এককালে এক ও বহু। মানুষ পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় (unity)। যে কোনও উপায়েই—সান্নিধ্য হেতু বা অন্য কোনও উপায়ে—এই দুইটী বিভিন্ন জিনিষ মানুষে সমন্বিত হইয়া থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষ একে বহু। কিন্তু কেবল একথা বলিলেই সমস্যাটীর মীমাংসা হইবে না। আমাদিগকে একথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, এক পরমপুরুষ আছেন এবং জীবসকল তাঁহারই অংশ বা বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কেবল এই উপায়েই আমরা 'এক ও বহুর' সমস্যাটীর মীমাংসা করিতে সক্ষম হইব। এ বিষয়ে সাংখ্যের মত কি? সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যের অন্যান্য পুস্তকগুলিতে পুরুষের লক্ষণটী কেবল সাধারণভাবেই করা হইয়াছে, যদিও তাহারা বলিতেছে যে, পুরুষ বহু, অর্থাৎ জীবের ভিন্ন লক্ষণ প্রদত্ত হয় নাই—তাহাদের একটী সাধারণ লক্ষণই দেওয়া হইয়াছে। জীবও অসীম, অপরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি, অর্থাৎ পরমপুরুষের যে গুণগুলি আছে জীবেরও সেগুলি আছে। কাজেই তাহারা সকলেই অবিকল একরূপ, কিন্তু তথাপি তাহারা ভিন্ন ও বহু। ইহা কিরূপে সম্ভবপর? একথা কেবল সম্ভব হইতে পারে যদি আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে, বস্তুতঃ এক পুরুষই বিদ্যমান এবং অন্যান্য পুরুষ তাঁহার অংশ বা বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অথবা সাংখ্যের কথায় বলিতে গেলে—প্রত্যেক জীবই কোনও নির্দ্দিষ্ট উপায়ে প্রকৃতিযুক্ত পরমপুরুষ। এই কারণেই সাংখ্য জীবকে অসীম, নিত্য, প্রভৃতি বলিতেছে। ইহার অন্য কোনও প্রকার মীমাংসা হইতে পারে না, কারণ 'পূর্ণস্বভাব' তথাপি 'বহু'—পুরুষের এই দুইটী বিশেষণ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে, যদি আমরা এই কথা ধরি যে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন, যেহেতু একেবারে ভিন্ন হওয়াতে তাহারা পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে তাহাদের পূর্ণত্বেরও লাঘব ঘটে।

আমরা যদি সাংখ্য-সূত্রের কথা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইহাও উপরি-উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। পুরুষবহুত্ব প্রতিপন্ন করিয়া (১অঃ ১৪৯সূঃ ও ৬অঃ ৪৫সূঃ দেখ) ইহা বলিতেছে—"উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ" (১অঃ ১৫০সূঃ)। অর্থাৎ "উপাধির বিভিন্নতা হেতু একই আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হয়, যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঘটাদিসংযোগ হেতু একই আকাশকে বহুরূপ দেখায়।" অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু বিবেচনা করেন যে, এই সূত্রটীতে বৈদান্তিকদের মতের কথা বলা হইয়াছে এবং সাংখ্যকার ইহার খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু এই মতের পরিপোষক কোনও প্রমাণ নাই। ঐই সূত্রটীকে নিম্নলিখিত সূত্রটীর সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক—"গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ" (৫১ সূঃ), অর্থাৎ "শ্রুতি পুরুষের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ইঁহার উপাধি সম্বন্ধেই, যেরূপ আকাশ সম্বন্ধে"। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্ব-শ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেনাকাশস্যেবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেত্যর্থঃ। অত্র চ প্রমাণম্—'ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ'।" অর্থাৎ, "অবশ্য বেদেতে পুরুষের গতি সম্বন্ধে উক্তি আছে। কিন্তু এগুলি শ্রুতি ও স্মৃতিতে পুরুষের সর্ব্বব্যাপিত্বের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত সমন্বয় করিয়াই বুঝিতে হইবে; সুতরাং উহা কোন পুরুষের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, এইরূপ ধরিতে হইবে, যেরূপ আকাশের গতি উহার উপাধিতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ এই—যখন একটী ঘট একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সেই ঘটেতে আবদ্ধ আকাশ যেরূপ গতিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বস্তুতঃ ঘটটিই গতিমান—আকাশ নহে, সেইরূপ উপাধিযুক্ত জীবও এ সম্বন্ধে আকাশের ন্যায়। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্, ১৩"। ৬ অধ্যায়ের ৫৯ সূত্রটীর সহিত এইটী পাঠ করিতে হইবে। সেই সূত্রটী এই—"গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ", অর্থাৎ "এবং যদিও আত্মা সর্ব্বব্যাপী, তথাপি শ্রুতিতে ইহার গতিসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে কালক্রমে উপাধিসংযোগে ইহার ভোগদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যেরূপ আকাশ সম্বন্ধে।" এখানে বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টতঃই স্বীকার করিতেছেন যে উপরি-উক্ত সূত্রগুলি সাংখ্যেরই মত প্রকাশ করিতেছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ এক, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু উপাধিসংযোগে সীমাবদ্ধ ও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম অধ্যায়ের ১৫০ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই ভ্রান্ত এবং শেষোক্ত দুইটী সূত্রের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অসমঞ্জস। ভ্রমাপনোদনের জন্য ১৫০ সূত্রটীর সহিত যুক্ত যে ১৫১, ১৫২,

১৫৩ ও ১৫৪ সূত্রগুলি—তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

১৫১ সূত্রটী এই—"উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্‌", অর্থাৎ "উপাধি ভিন্ন, কিন্তু তাহার ধারক নহেন"। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ ঘটাদি উপাধিভেদে আকাশকে ভিন্নরূপ দেখায় কিন্তু ইহা বস্তুতঃ যাহা তাহাই থাকে, সেইরূপ আত্মা স্বভাবতঃ যাহা তাহাই থাকিলেও উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু ১৫০ সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই ইহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ১৫০ সূত্রের তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত; সুতরাং এই সূত্রটীরও তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত।

১৫২ সূত্রটী এই—"এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ", অর্থাৎ "একরূপে যে আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস বা আরোপ হইতে পারে না।" আত্মা যদি বস্তুতঃ এক হয় তাহা হইলে ইহা কিরূপে বহু হইতে পারে, এবং কিরূপেই বা পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম—একত্ব ও বহুত্ব—এককালে ইহাতে থাকিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী এই আপত্তির উত্তরস্বরূপ। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রটীর ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এই সূত্র সম্বন্ধেও সেই কথা।

১৫৩ সূত্রটী এই—"অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ", অর্থাৎ "প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় বহুত্ব আত্মার উপর কেবল আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা এক হওয়ায় ইহা বস্তুতঃ আত্মার ধর্ম্ম নহে।" অথবা সহজ কথায় বলিতে গেলে বহুত্ব বাস্তবিক প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, কিন্তু প্রকৃতি যখন পুরুষের সহিত যুক্ত হয় তখন স্বভাবতঃ এক হইলেও পুরুষকে বহু দেখায়। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যার ন্যায় তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাটীও ভ্রান্ত।

১৫৪ সূত্রটী এই—"নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ", অর্থাৎ "সাংখ্যে যে পুরুষের বহুত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বেদের পুরুষের একত্বের—অদ্বৈতত্ত্বের কোনও বিরোধ নাই, কারণ এই উক্তিগুলি পুরুষের জাতিত্ব সম্বন্ধে।" এই সূত্রটী একটী নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছে এবং সাংখ্যকারিকার ১০, ১১ ও ১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে গোলযোগ উত্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসার একটী উপায় বলিয়া দিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষের একত্ব বলিতে তাহার জাতিগত একত্বকেই বুঝাইতেছে, অপর পক্ষে পুরুষের বহুত্ব বলিতে তাহার ব্যক্তিগত (species) বহুত্বকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, পুরুষকে যখন এক বলা যায় তখন ইহাকে জাতিরূপেই বুঝায়, এবং যখন বহু বলা যায় তখন ইহাকে ব্যক্তিরূপেই, অর্থাৎ জীবরূপে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'জাতি'র যে দুইটী অর্থ হইতে পারে সে বিষয়ে যাহাতে গোলমাল না হইয়া যায় তাহাতে সতর্ক হইতে হইবে। ব্যবহারিক ন্যায়ে (formal logic) 'জাতি'শব্দে একজাতীয় জিনিষের সাধারণ গুণগুলি বুঝায়। সুতরাং 'জাতি' অর্থে কোনও বাস্তব জিনিষকে বুঝায় না, কেবল কতকগুলি গুণের সমষ্টিকেই বুঝায়; আর ব্যক্তিই হইতেছে বাস্তব জিনিষ, অর্থাৎ যাহার গুণ আছে। 'জাতির' এই অর্থে জীবই বাস্তব এবং পরমপুরুষের কোন বাস্তব সত্তা নাই; ইহা কেবল জীবের সাধারণ গুণগুলির সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরমপুরুষের এই অর্থ হইতে পারে না। 'জাতি'র অপর একটী অর্থ আছে। দর্শনশাস্ত্রমতে 'জাতি' অর্থে একটী বাস্তব পদার্থকে বুঝায়, ব্যক্তিসকল ইহারই প্রকাশ মাত্র (হেগেল ও তাঁহার অনুচরদিগের মত)। এই অর্থে পরমপুরুষই একমাত্র বাস্তব পদার্থ এবং জীবসকল তাঁহার প্রকাশমাত্র, সুতরাং জীবসকল পরমপুরুষের ন্যায়ই বাস্তব। সাংখ্যকারিকাপ্রণেতা যখন বলিতেছেন যে, পুরুষ এককালেই এক ও বহু, তখন তিনি 'জাতি' ও 'ব্যক্তির' উপরি-উক্ত অর্থই বুঝিতেছেন। এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যাঁহারা বলেন যে পুরুষের একত্ব একটী জাতিবাচক শব্দ মাত্র, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাংখ্যমতে পুরুষের এমন কোনও গুণ নাই যাহা দ্বারা এক হইতে অপরকে পৃথক করা যাইতে পারে; এবং আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগুলি পুরুষের নহে, কিন্তু যে উপাধির সহিত পুরুষ যুক্ত উহারা তাহারই গুণ। সুতরাং যাহা দ্বারা এক পুরুষকে অপর পুরুষ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও গুণ না থাকায়, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। সংক্ষেপে, পুরুষ এক এবং উপাধিযুক্ত হইয়াই তিনি বহুরূপে প্রকাশবান।

গ্রন্থপরিচয়।

গীতা-রহস্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। লেখক বালগঙ্গাধর তিলক, অনুবাদক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৩৲ টাকা। আদি ব্রাহ্মসমাজ ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভারত-তিলক বালগঙ্গাধর তিলক রাজনীতিক বলিয়া

স্বদেশে ও বিদেশে যেমন পরিচিত, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তেমনই বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত। সরকার রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে যখন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার শ্রমবিরতি ছিল না—সেই অবস্থায় তিনি আর্য্যজাতির আদিভূমি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। অনেকে হয় ত জানেন না, প্রথমবার যখন তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন বিলাতের কোবিদসমাজ তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সে কার্য্যে আচার্য্য ম্যাক্সমূলার অগ্রণী ছিলেন।

দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইয়া তিনি গীতার ব্যাখ্যা রচনা করেন।

তিলক আর্য্যজাতির আদিভূমি সম্বন্ধে যেমন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তেমনই গীতায় উক্ত কর্ম্মযোগের স্বরূপ দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।"

বাস্তবিক গীতা অনন্ত জ্ঞানের আকর। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও ধর্ম্মভেদে গীতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রতীচ্য জ্ঞানের আলোকেও গীতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে সকল ভারতবাসী সে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ অকালনির্ব্বাপিত-জীবনদীপ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'প্রচারে' তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তিনি সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ভারতের এই নবযুগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন লইয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তির দিক হইতে গীতার ব্যাখ্যা অনেক হইয়াছে—এ ব্যাখ্যা কর্ম্মের দিক হইতে। আজ যখন আমাদের দেশে কর্ম্মের তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তখন তিলকের মত কর্ম্মী কি ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাখা দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজন।

তিলকের এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে। তিলকের মূল মারাঠি পুস্তক হইতে শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ পাঠ করিলে অনুবাদকে মূল বলিয়া ভ্রম হয়।

আজ বাঙ্গালায় গীতা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে যে এই পুস্তকের আদর হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিলকমহাশয়ের এই রচনা ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। গীতা সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাহার ভিত্তি। সেইজন্য গীতাপাঠে সকল মতাবলম্বীই উপকৃত হইতে পারেন। সেইজন্যই য়ুরোপে ও মার্কিণেও গীতা অনূদিত ও আদৃত হইয়াছে। এদেশে গীতা হিন্দুর পরম আদরের। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্মবীর বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের এই কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অনেক নূতন বিষয় পাইবেন। 'দৈনিক বসুমতী'—১৩৩১ ১লা মাঘ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই পুস্তকে ভগবানের আশ্বাসবাণী—ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী,—ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, সত্য ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম, ঈশ্বর ও মানব, ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং ঈশ্বর অন্তর্য্যামী,—প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ক বিস্তর আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রগাঢ় আন্তরিকতা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকে স্থলবিশেষে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও এরূপ পুস্তক যে ভগবদ্বিশ্বাসীর পক্ষে আলোচ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কাগজ ছাপা এবং বাঁধাই উত্তম। ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান,—আদি ব্রাহ্মসমাজ; ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড—যোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বঙ্গবাসী—১৩৩১ সাল, ১৬ই ফাল্গুন।

চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষিতীন্দ্রবাবু সুপরিচিত। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার "আর্ট ও সাহিত্য" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তাহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব আকস্মিক ব্যাপার নহে; ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসংঘর্ষের স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সহজ ভাষায়, সরল ও প্রাঞ্জলভাবে এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক কূটতর্ক নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ তাহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে একটি

বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এই শক্তির মূল উৎস কোথায়, তাহা জানিতে হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। অনেক ব্রাহ্ম লেখকের রচনার মধ্যে আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি একটা কুসংস্কারপূর্ণ অবজ্ঞার ভাব দেখিতে পাই; ক্ষিতীন্দ্র বাবু যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারমুক্ত উদার মনোভাব লইয়াই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীমতী কামিনী রায় এই গ্রন্থের একটা সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আয়তন হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অতি সুলভ।

আনন্দবাজার—৮ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" পঞ্চদশ কথায় ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটী কথা এমন সরল সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় ইহা প্রতিদিন পাঠ করি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুপরিচিত লেখক, তাঁহার ভাষা যে সুন্দর তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। তিনি এই গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিতে পারিলে কখনই এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিতে পারিতেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানা ধর্ম্মপ্রাণা, বিদুষী, 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়ার ভূমিকায় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেক লোক তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন। সাধু যাঁহাদের সংকল্প, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের মত প্রাচীন সমাজে অবাধে চলিতেছে। সেইজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারি, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও আদরণীয় হইবে। আমার মনে হয়, এই রকমের একখানা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া সঙ্গত; সাম্প্রদায়িকতা দোষে এই গ্রন্থখানা দূষিত হইলেও মূল ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

কলেজের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক শান্তি পাইবেন। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাত্রকে কুপথে পতিত হইতে দেখা যায়। এই সরল সহজ গ্রন্থখানা পাঠ করিলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সেই ভাবে না চলিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের দশম কথা, "মামেকং শরণং ব্রজ" ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ৯০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথা প্রতিদিন পাঠ করিলে সাংসারিক দুঃখ হইতে শান্তি পাওয়া যায়।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থ আরও লিখিয়া মানবজাতির কল্যাণ করিবেন।

প্রতিভা—মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩১।

প্রভাতী। (হিতৈষণা গ্রন্থাবলী ২৫নং) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড—আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী অক্লান্ত। ইহার পবিত্র লেখনী হইতে যে সকল সৎ-সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অনেকের সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত "হিতৈষণা গ্রন্থাবলী"র অন্যতম। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"ইহা একখানি গদ্য-পদ্যের গীতিকাব্য।" কেহ মনে করিবেন না যে ইহাতে পদ্য-রচনা আছে; গ্রন্থখানি আগাগোড়া কবিতাময় গদ্যে রচিত। ইহাতে যে গীতি আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তের নির্ম্মল আত্মা হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থখানি পবিত্র ভাবে ও পবিত্র চিন্তায় ভরপুর। পড়িতে পড়িতে মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়, এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। আজি-কালিকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ পবিত্র গ্রন্থ অতিশয় বিরল। বাঙ্গালীর নিকটে এরূপ গ্রন্থের সমাদর হইলে বুঝিব, বাঙ্গালী সত্য সত্যই উন্নত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। বাঙ্গালীর কি সেরূপ শুভদিন আসিয়াছে? পুস্তকের ভাষা কিরূপ সরল ও সুন্দর, তাহার একটু নমুনা আমরা যদৃচ্ছাক্রমে একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি:—

"স্বাধীন পুরুষের সন্তান তুমি! স্বাধীনতাই তোমার জন্মগত অধিকার। রিপুগণ তোমাকে দিবানিশি তাহাদের জালে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সাবধান—স্বাধীনতা কিছুতেই হারাইও না। এক মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা—অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করে। স্বাধীনতার শিঙ্গা বাজাইয়া দাও—স্বাধীনতার সহচর—প্রেম, ভক্তি দয়া প্রভৃতি—সকলে চলিয়া আসুক। রিপুগণের সঙ্গে লাগাইয়া দাও মহাসংগ্রাম। ইন্দ্রিয়-অশ্বের উপর চড়িয়া পড়—সংযমের লাগামে তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া যাও—ঐ সেনাপতি স্বাধীন পুরুষের নিকট হইতে আদেশ লইয়া এস, কি করিতে হইবে। হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিও না—নিজের গৃহে শত্রুগণকে প্রবেশ করিতে দিও না। নিদ্রিত থাকিয়া শত্রুগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিও না—জাগিয়া উঠ। বিবেক-বিচারের শাণিত তরবারি ধারণ কর—আর ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া বিপক্ষ রিপুগণের মধ্যে মৃত্যুর আগুন ছড়াইয়া দাও।" ইত্যাদি। এইরূপ সুন্দর সরল ভাষা নির্ম্মল তটিনীর উল্লাসময়

স্রোতের ন্যায় সর্ব্বত্র নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। পুস্তকের মুদ্রণ যেরূপ সুন্দর, বাঁধাইও তদ্রূপ। এই ক্ষুদ্র পবিত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

গন্ধবণিক্—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।

সংবাদ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব—বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ় তিন দিন ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত ৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল মহাশয়ের সহযোগিতায় 'ছায়াচিত্র' যোগে শ্রীমন্মহর্ষিদেব সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটী বর্ণনাভঙ্গিতে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

গত ৮ই আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বিএ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করেন। সাংখ্যতীর্থ-মহাশয় শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিকের অনুরোধক্রমে তাঁহার "পাপের উৎপত্তি ও তাহার প্রতীকার" বিষয়ে লিখিত নিবেদন পাঠ করেন। উহা আগামী শ্রাবণ-সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। বরদা বাবুর আরাধনা ও উপদেশ অতি সুন্দর হইয়াছিল।

গত ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭৷৷ ঘটিকার সময়ে জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল, বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণি বাবু একটী সুগম্ভীর উদ্বোধন করিলে ক্ষিতীন্দ্র বাবু "ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ" বিষয়ে সময়োপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ পাঠ করেন। গত কল্যের 'নিবেদন' ও অদ্যকার এই 'উপদেশ' মুদ্রিত হইয়া পূর্ব্বেই উপাসকমণ্ডলীর হস্তে বিতরণ করা হয়। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর উপদেশটী এই আষাঢ়-সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

কয়েকটী হিন্দু ও মুসলমান ভদ্র যুবক সম্মিলিতভাবে গত ৮ই ও ৯ই আষাঢ়ের সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সমবেতকণ্ঠে গীত ব্রহ্মসঙ্গীত গুলি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। গত ৭ই আষাঢ় ভবসিন্ধু বাবু রাজা রামমোহন রায়ের "ভাব সেই একে" ইত্যাদি সঙ্গীতটী অতি উৎসাহের সহিত গাহিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা—সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সত্যের আরাধনাই তত্ত্ববোধিনীর এই সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্রত কঠিন হইলেও, সুখের বিষয়, তাহার ভঙ্গাপরাধ কোনও দিন ইহাকে স্পর্শ করে নাই। যাঁহারা ইহার নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা ইহার অকপট সত্যসেবার পরিচয় প্রতি মাসেই পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে তত্ত্ববোধিনীই বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা, যে গতানুগতিকতার মোহে পড়িয়া বহিঃসৌন্দর্য্যকেই চরম বলিয়া মানিয়া লয় নাই; আকারে-প্রকারে যুগোচিত দীনতা ইহার থাকিলেও প্রবন্ধগুলি যে সত্যই জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান তাহা বিভিন্ন সাময়িকে উহাদের অনেকগুলি নিয়মিত উদ্ধৃত হওয়াতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সম্প্রতি 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' 'শিক্ষা-সমাচার' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতিতে ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজের 'অসাম্প্রদায়িকতা' কেবল মৌখিক নহে—ইহা সত্যসত্যই এত উদার যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই ইহাকে 'একান্ত আপনার' ভাবিয়া প্রীতি ও প্রেমে অভিষিক্ত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুসমাজের মুখপত্র বরিশালের 'কাশীপুরনিবাসীর' গত ১৫ই আষাঢ়ের মন্তব্যটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লিখায় আমাদের হিন্দু সমাজের উপকার হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কয়বার আসেন" শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আমাদের মতানুরূপ না হইলেও ব্রাহ্মণের গৌরববর্দ্ধক প্রবন্ধ আদি ব্রাহ্মসমাজ মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়া ব্রাহ্মণের করণীয় কার্য্য করিতেছেন, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য"।

স্থানান্তরে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যে গ্রন্থপরিচয় প্রকাশ করিলাম, উহা হইতেও আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৬ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯। সন্ধান পথে।

বন্ধু হে! তুমি আমায় ডাক দিয়াছ। তোমার সেই ডাক শুনিয়া আমি আজ তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। কিন্তু তোমার এ কি লুকোচুরি—তুমি অনবরত ডাক দিতেছ, আর সেই ডাকের প্রতিধ্বনিতে ভূধর সাগর বন উপবন গগন ভুবন সমস্তই ভরিয়া উঠিতেছে; তাই আমি প্রতিনিয়তই তোমার ডাক শুনিতে পাইলেও তুমি যে ঠিক কোথায় আছ, তাহা ধরিতে পারিতেছি না! তুমি ডাকিতেছ, আর আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না—এক এক সময় ইহার জন্য আমার প্রাণ এতই আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠে যে, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; এক মুহূর্ত্তও আমার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমি যে সুখের জন্য তোমাকে পাইতে চাই, তাহা মনে করিও না। আসল কথা এই যে, তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও আমি থাকিতে পারি না। আমি জানিয়াছি, তুমি আমার কি রকম বন্ধু—তাহা জানিয়া আমি তোমা হইতে দূরে কি প্রকারে সরিয়া থাকিব? তুমি যদি আজ আমাকে দেখা না দাও—দিও না; আমি তোমার জন্য সুদীর্ঘ দিবসরাত্রি, সুদীর্ঘ ঋতু সম্বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব, কিন্তু তবু আমি অপর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে ধাবিত হইব না। আমাকে দুঃখ দিয়া যদি তোমার সুখ হয় হৌক, কিন্তু বন্ধু! দেখো, আমাকে মরিতে দিও না। বন্ধু! আবার তুমি ডাক দিতেছ; তোমার ডাক শুনিয়া তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। বাহিরে সমস্ত বন উপবন তো তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—কোথাও তো তোমায় দেখিতে পাইলাম না, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার ডাক শুনিতেছি। দাঁড়াও—এবার তোমাকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছি। আমি এত সন্ধানে তোমার সন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া তোমার সন্ধান করিবার কথা একবারও মনে পড়িল না—আশ্চর্য্য! এবার একবার অন্তঃপুরে গিয়া সন্ধান করিয়া দেখি—দেখি, তোমার সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

১০। অন্তরে।

বন্ধু! তুমি যে অন্তঃপুরে আসিয়া খেলা করিতে থাকিবে, আর সেখান হইতে আমাকে ক্রমাগত ডাক দিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? আমি তোমাকে বাহিরে বাহিরে খুঁজিয়াই হয়রাণ হইতেছিলাম। ভালই হইয়াছে যে, আমি তোমাকে অন্তঃপুরে দেখা পাইয়াছি। দাঁড়াও বন্ধু! আমার প্রাণের পূজা একটু তোমার চরণে নিবেদন করি। তোমাকে আজ আমার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করি। দেখ বন্ধু! তুমি অন্তঃপুরে আসিবে

জানিয়া সেখান হইতে যত মলিনতার আগাছা ছিল, সমস্তই তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেখানে শুভ ভাব ও শুভ কর্ম্মের চারাগাছ বসিয়াছে। আজ দেখ, সেই সমস্ত গাছে কেমন বিশুভ্র সুন্দর ও সুগন্ধ ফুল ফুটিয়াছে। এই সমস্ত ফুল তোমার হাতে তুলিয়া দিতে আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; এই সমস্ত ফুল দিয়াই তোমার চরণপূজা করিতে আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। মনে পড়ে—তোমারই সুবৃহৎ বাগান হইতে তোমারই এই সমস্ত চারাগাছ আমার অন্তঃপুরের বাগানে বসাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলে? কেবল পাঠাইয়া তুমি ক্ষান্ত হও নাই—আমার অজ্ঞানতই তুমি আবার সেগুলি সযত্নে বসাইয়া দিলে—কাহাকেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দাও নাই। আজ যখন তুমি আমার সেই অন্তঃপুরে আসিয়াছ, তোমাকে যখন এত নিকটে পাইয়াছি, তখন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা না করিয়া, তোমারই দেওয়া গাছের ফুলে তোমারই পূজা না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না। তোমাকে আজ আমার অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া আনিব, দেখিবে—সেখানে কত রকমেরই ফুল ফুটিয়াছে—তুমি তাহার সুগন্ধে আনন্দিত হইয়া উঠিবে। তোমাকে আজ আমার অন্তঃপুরে পাইয়া আমার কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা শত মুখেও ব্যক্ত করিতে পারি না। আজ আমার কাছে এই আকাশ মধুময়, এই চন্দ্রতারকা মধুময়, আমার অন্তর বাহির সমস্তই মধুময়।

১১। বিরহে।

বন্ধু! বন্ধু! তোমার অদর্শনে যে এত জ্বালা, তা আগে জানিতাম না। দিনরাত যে কোথা হইতে আসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা চক্ষে যেন দেখিতেই পাই না। সমস্ত দিন, সারা রাত্রি প্রাণের ভিতর কি যেন এক আগুন জ্বলিতে থাকে। চারিদিকেই যেন অন্ধকার দেখি। চন্দ্র সূর্য্য—কিছুই তো আর চক্ষে দেখিতে পাই না—অন্ধকার—অন্ধকার! দেখা দাও বন্ধু—দেখা দাও। তুমি যাহার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়াছ, সেই বন্ধু যদি মৃত্যুমুখে পড়ে, তাহাই কি তোমার ভাল লাগিবে? বন্ধু! প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বে একটীবার দেখা দাও। তুমি কি প্রীতিদৃষ্টিতে ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখা দিয়াছিলে, সে দৃষ্টি যে আমার নয়নের প্রতি অণুপরমাণুতে বাঁধা আছে। সে দৃষ্টি যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না। সে দৃষ্টি ভুলিবার পূর্ব্বে যেন আমার শতবার মৃত্যু হয়। না—না—আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না। প্রাণের ভিতর কি এক আগুন থাকিয়া থাকিয়া ঝলসিয়া উঠিতেছে। সেই আগুন আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি জানিতেছি; অথচ সেই আগুনে দগ্ধ হওয়াই বড় মিষ্ট লাগিতেছে—সেই আগুনকে প্রাণের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিতেই যেন বড় ভাল লাগে, তাহাতেই যেন জীবন পাই। লোকে বুঝি ইহাকেই বিরহের আগুন বলে। এই আগুন এত ভাল লাগে বলিয়াই ইহার বিষয়ে অশ্রুবারিসিক্ত এত সুমিষ্ট কবিতা প্রাণের উৎস হইতে বাহির হয়। এই বিরহের আগুনে, বন্ধু তুমি আসিয়া দেখ, আমার সেই পূর্ব্বের হাসি, প্রাণের সেই তরল আমোদ আহ্লাদ সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বিরহে প্রাণটা যে সমস্তক্ষণ তোমাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে,—তাহাতেই কি এক গভীর আনন্দ সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আশাতেই আমি এত দিন এত রাত তোমার অদর্শনের সুতীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া আসিয়াছি। বন্ধু গো! আর আমাকে নিরাশ করিও না, আমার হৃদয়মন ভাঙ্গিয়া দিও না—একবার—বন্ধু আমার—একবার আসিয়া দেখা দাও—আমার সমুদয় দেহমন তোমার মুখের অরুণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

১২। প্রেমপ্রবাহে।

বন্ধু হে! আমি তোমার ভালবাসার জালে পড়িয়াছি, তাহা তো তুমি দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু তুমিও যে জালে পড়া হইতে বাদ পড়িয়াছ, তাহা তো আমার মনে হয় না। আমার বেশ মনে হইতেছে, তুমিও আমার ভালবাসার জালে পড়িয়া গিয়াছ। তোমার বিরহে আমার তো বুক চক্ষের জলে ভাসিয়া যায়, আমারও বিরহে কি তোমার হৃদয় অশ্রুজলে ভাসিয়া যায় না? তাহা যদি না হইবে, তবে আমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া আবার আমার কাছে ফিরিয়া আস কেন? থাকিতে পার

না বলিয়াই তো আস? আমার হৃদয় তো তোমাকে দিয়া বসিয়াছি—তোমার সমস্ত হৃদয়খানি আমি পাই না কেন? তোমার এতটুকু ভালবাসা যদি পাই, অন্তত তোমার ভালবাসার এতটুকু যাহাতে না হারাই, তাই তো আমি তোমার প্রেমে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার তুমিই সব—তোমাকেই আমি অকূলের কূল বলিয়া চিনিয়াছি। আমি তাই নির্ভয়ে ভাসিয়া পড়িয়াছি—তোমার সঙ্গে মিলিব বলিয়া সকল সংসার ছাড়িয়া দিয়াছি—পরীক্ষা করিতেছি যে, তুমি আমার নিকট সমস্ত ক্ষণ ধরা দাও কি না। কিন্তু যাই বল বন্ধু—তোমাকে ভালবাসিলে যে এত জ্বালা, এত দুঃখ, তাহা আমি আগে জানিতাম না। সমস্তক্ষণই তো ভয়েই সারা হই, কখন্ কি কাজ করি, যাহা তোমার অপ্রিয় হইতে পারে। যাই হৌক্, বন্ধু! যদি দৈবাৎ তোমার কোন অপ্রিয় কাজ করিয়া ফেলি, তাহা তুমি ক্ষমা করিও—আমাদের বন্ধুতা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আমি সুখসম্পদ কিছুই চাহি না, যদি তোমাকে নিত্যসঙ্গী চাই। আমার গর্ব্বগুমর সমস্তই গিয়াছে—এখন তুমি আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর—তাহাতেই কৃতার্থ হইব।

১০। শান্তিভিক্ষা।

বন্ধু গো! আর তো পারি না। প্রাণের ভিতর অশান্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। যতই চাই অশান্তিকে দমনে রাখিতে, অশান্তি যেন ততই ফুটিয়া উঠিতে চায়। কেন?—জানি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র কর্ণধার, তবু কেন অশান্তি সজোরে আক্রমণ করে? এই অশান্তির জ্বালায় কতই ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াই—এ কাজে সে কাজে কত কাজেই না হাত দিই—তবু তো প্রাণ হইতে অশান্তিকে তাড়াইতে পারি না? কেন বন্ধু—কেন? তোমার পার্শ্বে যখন বসিবার দুদণ্ড অবসর পাই, তখনই যাহা একটু শান্তি পাই; তোমা হইতে একটুখানি সরিয়া গেলেই শতবিধ কাজের কথা আসিয়া পড়ে। আমি তোমার চোখে চোখ রাখিয়া কাজ করি বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর সমস্তক্ষণই ধুকফুকানি হইতে থাকে—সর্ব্বদাই একটা ভাবনা হইতে থাকে যে, আমি ঠিক তোমার আদেশমত, অভিপ্রায়মত কাজগুলি সমাধা করিতেছি কি না। ধুকফুকানির আর একটা কারণ মনে হয় যে, আমার যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা তোমার কাছে চাই—কিন্তু তাহার পরে মনে হয়, পাইব, কি, পাইব না? বন্ধু! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু বলিয়াই আমার যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার কাছেই ভিক্ষা করি। আমি ঠিক করিয়াছি—আমি সংসারে কাহারও নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিব না। তোমার নিকট ভিক্ষা করিবার আর একটী কারণ এই যে, ভিক্ষা করিতে গেলেই তো আগে তোমার কাছে দাঁড়াইতে হইবে। তোমার কাছে দাঁড়াইলে, বন্ধু! তুমি যে প্রকার আদর কর, আমার উপর তোমার যে প্রকার স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহাতে মনে হয়, আমি বুক চিরিয়া আমার সমুদয় প্রাণখানি তোমার হাতে তুলিয়া দিই। কি মধুর হাসি যে তুমি হাস, এ সংসারে একমাত্র জননীর হাসি ব্যতীত আর কোথাও তাহার তুলনা পাই না। তখন আমার সমুদয় প্রেম সমুদয় ভালবাসা আমি মনে মনে তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া তবে সুখ পাই আরাম পাই। বন্ধু! বন্ধু! আমি আর আমার হৃদয়কে উপড়াইতে পারিতেছি না—তুমি তোমার হাতে তাহা উপড়াইয়া লও—তোমার দেওয়া ব্যথায় আমি জীবনলাভ করি। হৃদয়টাকে লইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্নেহপ্রেমের উপর যদি আমার প্রাণের এককোণে এতটুকু সংশয় থাকে, তবে সে সংশয়টুকুও উৎপাটিত করিয়া ফেল। আমার মনপ্রাণ একটুখানি শান্তিলাভ করুক; আমি ধুকফুকানির হস্ত হইতে রক্ষা পাই।

পাপ ও তাহার প্রতীকার।*

(শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক)

মানুষের জীবন একটী মহা সংগ্রাম-স্থল। মানুষ দ্বিভাবাপন্ন। তাহাতে পশু-ভাব এবং দেবভাব, দুই ভাবই আছে। কৈশোরে পদার্পণ করিবার সময়, মানুষ এই দুই ভাবের সন্ধিস্থলে আসিয়া

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই আষাঢ় বুধবার, সান্ধ্যোপাসনায় পঠিত।

উপস্থিত হয়। তখন হইতেই তাহার অন্তরে এই দুই ভাবে প্রতি-নিয়ত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। পশু-ভাব, মানুষকে এক দিকে লইয়া যাইতে চাহে এবং দেব-ভাব ঠিক তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে আকর্ষণ ক'রে। "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥" পশুভাব যে পথে যাইতে বলে তাহা প্রেয়—তাহা আপাত-মনোরম। কারণ ইন্দ্রিয়সুখ—বিষয়সুখ তাহার লক্ষ্য। দেবভাব যে দিকে আকর্ষণ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু তাহা মানুষকে সত্যের পথে—স্বর্গের পথে—অমৃতের পথে লইয়া যায়। প্রেয় ক্ষণভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু সুখ মানুষের সম্মুখে ধরে। শ্রেয় অক্ষয় শান্তিসুখ—ব্রহ্মের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ আনিয়া দিতে চাহে। একটী দৃষ্টান্ত—কখন হয়ত একটা মিথ্যা কথা বলিলে, একটু প্রবঞ্চনা করিলে একটা বিষয় লাভ হয়, অথবা কোন বিষয় রক্ষা পায়। এই সময় অসুর ভাব মিথ্যা কহিতে বা প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্তি দিতে থাকে; এবং অপর দিক্ হইতে দেবভাব তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামে বিবেক মানুষের সহায় হয়। কিন্তু তথাপি, অনেক সময়ে অসুর জয়লাভ করে এবং মানুষ নিষিদ্ধ পাপ কার্য্য করিয়া ফেলে। এই প্রকারে মানবাত্মায় পাপের উৎপত্তি হয়। পাপগ্রস্ত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ঐ উক্তি, একটী সুন্দর আখ্যায়িকা (parable) মাত্র। বালক বালিকারা পাপশূন্য, নির্ম্মল এবং সরল-স্বভাব। মহামুনি যিশু বলিয়াছেন, "Suffer the little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of God." (Mark x. 14) ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, নিষেধ করিও না; কারণ স্বর্গরাজ্য উহাদেরই মতন। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ঐ উক্তি স্বয়ং ঈশাই খণ্ডন করিয়াছেন। মানুষের জীবনে, সংগ্রাম না থাকিলে, তাহাতে এবং অপরাপর জীবে কোন প্রভেদ থাকিত না। দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম না থাকিলে, সুখ-স্বচ্ছন্দতার আস্বাদন এত মিষ্ট লাগিত না। সংগ্রামের দ্বারা অসত্যকে পরাভূত করিতে না হইলে, সত্যের এবম্প্রকার মর্য্যাদা থাকিত না। পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে না হইলে, ধর্ম্মজীবনের এতাধিক গৌরব থাকিত না। সংগ্রামবশতই মানুষের জীবনে পতন ও উত্থান লক্ষিত হয়; মানুষ পড়ে এবং উঠে। কিন্তু যে ক্রমাগত পড়ে, তাহার উঠিবার শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। তখন সে লঘু হইতে গুরুতর পাপপঙ্কে ডুবিয়া মরে। সে চুরি, ডাকাতি, অবলা নারীর উপর পাশব অত্যাচার এবং নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাকে নরপশু বলে—আকারে মানুষ, কিন্তু আচরণে হিংস্র পশু অপেক্ষাও জঘন্য। যিনি প্রথম প্রথম পড়িয়া আর পড়েন না—ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে, উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া যান, প্রলোভনে বিকলচিত্ত হন না, তিনিই মানুষ-দেবতা—নর হরি—ব্রহ্মের ভাগ্যবান প্রিয় পুত্র বা কন্যা। বিনা সাধনে, মানুষ এই উন্নত স্থানে উপনীত হইতে পারে না। সঙ্গীত, বাদ্য ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করা, জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধনোপার্জ্জন করা, কত পরিশ্রম ও সাধনাসাপেক্ষ। আর পাপ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে ধরা, বিনা সাধনে সম্ভব হইতে পারে?—কখনই না।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

মানুষের স্বভাব এই যে, চিরদিন এক প্রকার অবস্থা তাহার ভাল লাগে না। এক প্রকার আহার পরিচ্ছদ, এক স্থানে বাস এবং একই জলবায়ু, তাহার তৃপ্তিকর হয় না। ব্রহ্মের সৃষ্টি বিচিত্র। মানুষ বিচিত্রতা ও পরিবর্ত্তনের জন্য লালায়িত। সাধন সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ; ব্রহ্ম-পূজা একটী সাধন। প্রায় প্রতি হিন্দু গৃহস্থের বাটীতে দেবতা আছেন; তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা পুরাতন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে মন তৃপ্তি মানে না। পরিবারস্থ সকলে, তাহাতে যোগ দেন না। সেইজন্য নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা কেবল সেই পরি-

বারের নহে, সমস্ত গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের আনন্দভূমি হয়। নৈমিত্তিক পূজার ইহা এক প্রধান উদ্দেশ্য। বৈদিক ঋষিগণ নিত্যপূজা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যাগ-যজ্ঞ করিতেন। ব্রহ্মবাদীও প্রতিদিন অন্ততঃ দুই সন্ধ্যা ব্রহ্মপূজা করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন সাধকমণ্ডলীর সঙ্গে সাপ্তাহিক পূজা করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আবার ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করেন। ঐ সকল ব্রহ্মোৎসব, এক-একটী ব্রহ্মযজ্ঞ। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ব্রহ্ম অশরীরী, জ্ঞান-স্বরূপ, চৈতন্যময় পরমাত্মা। মানবাত্মাও নিরবয়ব। তাহার রিপুগণ—পাপ-তাপ, মোহ-মায়া, এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা—সকলই নিরাকার। সুতরাং ব্রহ্মযজ্ঞ আধ্যাত্মিক ভিন্ন হইতেই পারে না। ইহাতে জড়ভাব কোনও প্রকারে আসিতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্মই এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। এ যজ্ঞে, যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিতে হয় না। যজ্ঞকুণ্ড খনন করিতে হয় না। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয় না। ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আহুতি দিবার এবং হোতার আবশ্যক হয় না। প্রত্যেক সাধকই হোতা। অতএব ইহা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াপূর্ণ। সরল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান, অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং কাতর প্রার্থনা এ যজ্ঞের উপকরণ। পাপমুক্ত এবং শুদ্ধচিত্ত হইবার জন্য, সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরব্রহ্মের চরণ-তলে উপনীত হওয়া এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। মোহ-জনিত পাপের প্রতীকার লাভের অভিপ্রায়ে ইহা একটী প্রধান সাধন।

পাপের প্রতীকার।

ব্রহ্ম-যজ্ঞ একটী সাধন-ক্ষেত্র। শুধু আরাধনা প্রার্থনা এবং সঙ্গীতে ইহা উদ্‌যাপন করিলে, ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পাপই মানবাত্মার সর্ব্বনাশ করে। আমরা কেন পরমাত্মাকে জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাই না? কেন তাঁহাকে আপনার অন্তর-বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারি না? স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষ পঙ্কিল অথবা চঞ্চল হইলে, তাহাতে কোনও পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না—বালুরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না—পাপ-কলুষিত মানবাত্মা দেদীপ্যমান পরব্রহ্মকে দেখিতে সক্ষম হয় না—তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল মুখচ্ছবি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। পাপই অন্তরায়—পাপই পরমাত্মাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মযজ্ঞকে আমাদের পাপ-মোচনের উপায় করা চাই। ব্রহ্ম জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ। প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তিনি আমাদের অন্তরাত্মায় ও শরীরের শিরায় শিরায় বর্ত্তমান। সেই হুতাশনের শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদের অন্তর-বাহির আলোকময় করিয়া রহিয়াছে। অগ্নি সমস্ত মলা ভস্মীভূত করিয়া সকল দ্রব্যকে পরিশুদ্ধ করে। খাদ-মিশ্রিত স্বর্ণ-রৌপ্য, সুনিপুণ স্বর্ণকার কর্ত্তৃক অগ্নি-যোগে বিশুদ্ধ হয়। লোলজিহ্ব সর্ব্বভুক্ ব্রহ্মাগ্নি আমাদের অপবিত্রতা ও পাপরাশি দগ্ধ-বিদগ্ধ করিয়া আত্মাকে বিমল করিবে। যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আমাদের পাপ, তাপ, মলিনতা ও দুর্ব্বলতা সেই ব্রহ্মহুতাশনে আহুতি দিতে হইবে।

আহুতি—কি কি আহুতি দিতে হইবে?

স্বার্থপরতা মানুষের বিষম শত্রু। "স্বার্থ-সাধন জন্য মানুষ না পারে এমন কর্ম্মই নাই। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ও পরদ্রোহিতার মূলে স্বার্থপরতা। স্বার্থ-সাধন-কল্পে মানুষ এ সকলই করিতে প্রস্তুত। আপন প্রয়োজনে প্রতিবেশীর নিকট হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী আমরা লই এবং কার্য্য সমাপনান্তে, পুনঃ পুনঃ না চাহিলে, তাহা ফিরাইয়া দেই না। যাহারা আমার নিকট অর্থ পাইবে, ডাকিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করা দূরের কথা, বার বার তাগাদা না করিলে দেই না। জনসমাজে কত প্রকার অভাব, রোগ ও যন্ত্রণা; অথচ আপনাকে লইয়া আমরা এত ব্যস্ত, সে দিকে দৃষ্টিপাত করি না। সর্ব্বাগ্রে এই স্বার্থপরতাকে "ব্রহ্মাগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিতে হইবে।

রিপুগণ মধ্যে কাম ও ক্রোধ বড়ই ভয়ানক। আমরা রমণীর মুখশ্রীতে ব্রহ্মেরই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বদা পবিত্র দৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করিতে সক্ষম হই না; ক্রোধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই না। ক্ষমা ও ধৈর্য্য এখনও অভ্যাস হয়

নাই। ব্রহ্মাগ্নিতে এই কাম ও ক্রোধকে আহুতি দিতে হইবে।

পরনিন্দা ও পরগ্লানিতে, মানুষ সাতিশয় আনন্দ লাভ করে। আমা অপেক্ষা কেহ গুণে বা জ্ঞান-ধর্ম্মে বড়, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি না। অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র মানুষ যে একেবারে দোষশূন্য হইতে পারে না, ইহা ভুলিয়া গিয়া—গুণ না দেখিয়াই—তাহার কেবল ছিদ্রানুসন্ধান করিতে আমাদের মন স্বতঃই ধাবিত হয়; এমন কি, খ্যাতনামা মহাত্মারাও আমাদের নিকট অব্যাহতি পান না। পাপপুণ্যের বিচারক অন্তর্যামী ব্রহ্ম, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরগ্লানি করিতে নিবৃত্ত হই না। "ব্রহ্মাগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া পরনিন্দা-রূপ মহাপাপকে আহুতি দিতে হয়।

অহঙ্কার অপেক্ষা রিপু নাই—"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"। অহঙ্কার এমন অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে যে, অতি বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও অনেক সময়ে তাহার হাত এড়াইতে পারেন না। যাহার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই—রূপ নাই, বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, ঐশ্বর্য্য নাই এবং পুণ্য নাই, সেও আত্মশ্লাঘা করিতে ছাড়ে না। এই দুর্ব্বলতা আহুতি দেওয়া চাই।

আমরা ঘোর সংসারাসক্ত। বিষয়সুখ আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব ধন। হৃদয়-সিংহাসনে অবিনাশী ব্রহ্মকে না বসাইয়া, সেই স্থানে অস্থায়ী অসার সংসারসুখকে স্থাপিত করিয়াছি। কোনও দুই পদার্থ এক সময়ে, একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। বিষয়বিরাগ না হইলে ব্রহ্মানুরাগ হয় না। এই সত্য জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না। ব্রহ্মের আদেশে, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, সংসার-ধর্ম্ম পালন করি না। তাঁহাকে ভুলিয়া সুখ অন্বেষণ করি। এই কারণে আমাদের এত দুর্গতি। কাজেকাজেই অনিত্য বিষয়-সুখ হারাইলে হাহাকার করি—শোকদুঃখে মুহ্যমান হইয়া, ব্রহ্মের মঙ্গলস্বরূপে সন্দিহান হই। এই বিষয়লালসা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে।

অনুতাপ।

শুধু আহুতি দিলে হইবে না। কৃত পাপ জন্য অনুতাপ চাই। অনুতাপ এই সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ ভিন্ন হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কীট বা অগ্নিপূর্ণ নরক নাই। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড পাপীর মস্তকে নিপতিত হয় না। অশরীরী আত্মার শারীরিক দণ্ড হইতে পারে না। অনুতাপাগ্নিতে আত্মার শোধন হয়। প্রকৃত আত্মগ্লানি সহজ ব্যাপার নহে। তাহা মানুষকে অস্থির করে। পানাহারে রুচি থাকে না। নিদ্রা হয় না। পাপ মার্জ্জনা করিলেন, যতক্ষণ ব্রহ্মের এই আশ্বাসবাণী প্রাণে বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। ঐ বাণী শুনিলে, তবে আত্মা সুস্থ ও প্রকৃতস্থ হইবে। এই প্রকার অনুতাপ পরিত্রাতার নিকট ভিক্ষা করা আবশ্যক।

সঙ্কল্প।

রিপুগণকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিলাম। আত্মগ্লানির জন্য পাপ-তাপহারী ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু প্রলোভনে পড়িয়া আমাদের আবার পতন হইতে পারে। সেইজন্য প্রতিজ্ঞার বল (willforce) আবশ্যক। কিছুতেই কুচিন্তায় কুআলাপে, কুসংসর্গে ও কুকর্ম্মে লিপ্ত হইব না, এরূপ দৃঢ়সংকল্প চাই। এই সাধুসঙ্কল্প শুদ্ধস্বরূপ পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই সিদ্ধ করিবেন। সাধক বুঝিতে পারুন আর না পারুন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, প্রকৃত অনুতাপ এবং সাধু সঙ্কল্পের পশ্চাতে, স্বয়ং ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন। অপূর্ণ, ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য যে, ব্রহ্মের অমোঘ সাহায্য ব্যতীত, পাপের সহিত যুদ্ধে—সংসার-সংগ্রামে, জয়ী হইতে পারে ?

ব্রহ্ম-কৃপা।

সর্ব্বোপরি ব্রহ্মকৃপার জন্য সরল প্রার্থনার প্রয়োজন। ব্রহ্মকৃপা মানুষের একমাত্র বল ও ভরসা। তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে, তাঁহার বিধান সকল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার সব ব্যবস্থা, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, তাঁহার পদে নির্ভর করত, বুক পাতিয়া, পিঠ পাতিয়া, তৎসমুদয় সহ্য করিতে হইবে। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই।

———

পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোন্ তিনবার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদেন ?

আদিশূরের কালনির্ণয় উপলক্ষে যে সকল মত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই সকল মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে আমরা বিশেষভাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার মোটামুটি তিনটী কালবিভাগ দেখিতে পাই—(১) সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি (আনুমানিক ৬৭৫ সম্বত); (২) সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯৩৯ সম্বত ৯৫৪ সম্বতের মাঝামাঝি); এবং (৩) সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি (৯৮৯ সম্বত--৯৯৯ সম্বত)। আমরা দেখি যে, সমস্ত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষিত হয়। সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি অন্তত একবার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলেন যে, ঐ সময়ে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন। যাঁহারা অপর দুই সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু কুলগ্রন্থ ও জনশ্রুতি আলোচনার ফলে এই অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি একবার যে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থকারেরা বিস্মৃত হইয়া কেবল গোত্রমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। পরে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি একবার ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; এবং দশম শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয়বারে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় পঞ্চব্রাহ্মণই আদিশূরের রাজত্বকালের ভিতরে তাঁহারই আহ্বানে আসিয়াছিলেন।

শূদ্রক রাজার কথা।

আমরা উক্ত আলোচনায় দেখিয়া আসিযাছি যে, কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আসিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলে আমরা এই সংশয়ও ব্যক্ত করিয়াছি যে, সম্ভবত কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ সমগ্র পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাইত যে, গ্রন্থকার বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন থাকে পাঁচ পাঁচ গোত্রের পাঁচ পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিবার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে দেখা যায় যে, "পুরা অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অন্ধ্রবংশোদ্ভব অপুত্রক রাজা শূদ্রক কর্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কারণেই সারস্বত দেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা সমানীত হইয়া যজ্ঞান্তে এই ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন" *। ইহার পরে ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন যাহা উল্লিখিত হইয়াছে †, আমাদের বলবৎ অনুমান হয় যে, এই বৎসরের সহিত ঐ শূদ্রকসমানীত ব্রাহ্মণদিগের আগমনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সম্ভবত প্রতিলিপি করিবার সময় উক্ত বৎসরের উপর ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "বিপ্রবর্জ্জিতে" বিশেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, শূদ্রক রাজার সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য হইয়াছিল—বৈদিক ধর্ম্ম তিরোহিতপ্রায় হইয়াছিল। আর, বঙ্গদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ স্থাপনের কথা হইতে বুঝা যায় যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে শূদ্রকনামে অন্ধ্রবংশীয় এক বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ‡

সারস্বত ও সপ্তশতী।

শূদ্রকসমানীত এই সারস্বত ব্রাহ্মণেরা কালে, অন্ততঃ আদিশূরের সময়ে, সপ্তসতী ব্রাহ্মণে পরিণত হয় §। এদেশে "গাঁই" বা গ্রামীণ হইবার –

* পুরান্ধ্রবংশক্রমেণৈব শূদ্রকেণ মহাত্মনা।
অপুত্রকেণ ভূপেন পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে। ১১
দেশাৎ সারস্বতাৎ রম্যাৎ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
যজ্ঞান্তেঽস্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিতা বিপ্রবর্জ্জিতে। ১২

† কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে।
শাকে শরাঙ্কঋতুমে জলদগ্নিতুল্যাঃ। ৫৪

‡ আমরা দেখি, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক চতুস্সদধিসলিল বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি পত্তনবতী বসুন্ধরায়" অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। Epigraphia Indica Vol VI P 143—গৌ. রা. ১১পৃঃ। এই শশাঙ্কই অন্ধ্রবংশীয় গৌড়পতি শূদ্রক নন তো? একই রাজা বিভিন্ন নামধারী নন তো?

§ (ক) "সারস্বতদেশীয়বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাষায়াং কথ্যন্তে"—৺বংশীধর বিদ্যারত্ন সংগৃহীত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ প্রণীত ব্রাহ্মণকাণ্ড ১১৪ পৃঃ।

(খ) "এতে সারস্বতদেশাৎ গৌড়রাজ্যে সমাগতাঃ।" ঐ ঐ

প্রণালী হইতে দেখা যায় যে, "গ্রাম" হইতেই "গাঁই"য়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ সারস্বত ব্রাহ্মণেরা সম্ভবত সপ্তশতী নামক এক বৃহৎ গণ্ড-গ্রামে * বাস করাতে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, আদিশূরের পূর্ব্বেই ঐ প্রথমাগত সারস্বত ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সাতশতপ্রায় ঘরে বা পরিবারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন ক্রমশ হয়তো সেই সপ্তশত ঘর হইতে তাঁহাদের গ্রামও সাতশতী নাম পাইল; আবার সেই সাতশতী গ্রাম হইতেই তথাকার সারস্বত ব্রাহ্মণেরাও সাতশতী ডাকনাম প্রাপ্ত হইলেন। উপরে ৯৩পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত বংশীবিদ্যারত্নসংগৃহীত এই বিষয়ক কারিকার সত্যতা অনেকের মতে সন্দেহের অতীত না হইলেও উহা হইতে এটুকু বুঝা যায় যে, কুলগ্রন্থকারদের মধ্যে সারস্বত ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের একটা ঘনিষ্টতম সম্বন্ধের অস্তিত্ব জানা ছিল †।

বীরসিংহের নিকট সপ্তশতী ব্রাহ্মণ প্রেরণের আখ্যায়িকা।

কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে এই একটি আখ্যায়িকা লিখিত আছে ‡:

'অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আদিশূর কাশীরাজকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া

---

* বর্ত্তমান "সাতশইকা"—রাঢ়দেশের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই সপ্তশতিকা জনপদের কতকাংশ এখন বর্দ্ধমান জেলায় "সাতশতকা" বা "সাতশইকা" পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সীমা উত্তরে ব্রহ্মাণী নদী, দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী ও পশ্চিমে সাহাবাদ পরগণা। রেণেলের মানচিত্রে এই পরগণা "সাতশতকা" নামে চিহ্নিত হইয়াছে। Indian Atlas Sheet no. 120 ব্রা, কা, ১১৫পৃঃ।

† তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥ ৪৯শ্লো, কু.- তং

‡ গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ
নানা বিদেশনৃপতের্মুকুটাঙ্কিতাংঘ্রিঃ।
জেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনঃ
দাতাবদাতকুলমাধবশূরসূনুঃ ॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধ
নৃপবরানান্তর্দ্দেশান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপং ॥
সৌরাষ্ট্রং মাগধান্তং নৃপমপি জিতবান্ বালবং জানবঞ্চ।
কাশী ইন্দ্রস্থলাভিরানৃপমপি সহসা তস্য সৈন্যাধিকারী ॥

স চৈকদা দূতমাহ—
রে রে দূত সুবুদ্ধিমন্ মম বৃতে কাশীপ্রমাশু ব্রজ।
তস্মৈতৎ কথয়স্ব মন্নৃপবরং তূর্ণং ভজস্বেরিতং ॥
নো চেদেবমথাস্তু কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভোঃ।
যেনাহং বিদলীকরোমি চ বলং দস্তীবরং ভাবনং ॥
আকর্ণ্য বাক্যং স নরেন্দ্রযোজ্যং যযৌ দ্রুতং দূতবরশ্চ কাশ্যাং।
দ্বারস্থলং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র ॥
কলয় কলয় রাজন্ মদ্বচো বীরসিংহ
দ্বারি কথয়িতুমাস্তে চাদিশূরস্য দূতঃ।

দূত ইতি সহসা দ্বং দূতমত্রানয়ৰ
বিহিতমিদমবোচৎ চাণ্ডরাজসভায়াং ॥
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাজসিংহাসনস্থং
ভরুতুরগগজেন্দ্রৈরাজভিঃ পণ্ডিতৈশ্চ।
রুচিরবদনজাতৈর্বেষ্টিতং প্রাপ্তদেশং
দ্বিজনরকুলমৌক্তৈর্দর্শয়ামাস দূতং ॥
রাজানং তং নমস্কৃত্য যথাযোগ্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
সভাপ্রস্তাবং কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্ঞোঽসৌ বক্তুমর্হসি ॥
কস্ত্বং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
ইতি রাজ্ঞা স পৃষ্টোঽসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরং ॥
দূতোঽহং নৃপবংশমৌক্তিকমণিশ্রীরাদিশূরোঽহং
তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভায়াস্তব।
তস্যাকর্ণয় দেহি যৎসমুচিতং শীঘ্রং করং কাময়ে
নো চেৎ শক্তিসমন্বিতো ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপাত্মজ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীরসিংহঃ ক্রোধেনারক্তনয়নো বভূব বীরসিংহনয়নোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিন্তয়ন্নাহ।
আদিশূরনৃপচক্রবর্ত্তিনো দূতমাক্ষিপত কোপি কোপতঃ।
বীরসিংহদূতোঽপি আদিশূরদূতং প্রতি আহ ॥
মত্ততাবশগতেন সত্ত্বতং বীরভাবমধিগম্য গর্জ্জিতং।
বীরসিংহনৃপসন্নিধাবাদিশূরকরিণা কিমকারি ॥
ততঃ বীরসিংহেন লিপিঃক্রিয়তে।
স্বস্তি শ্রীযুতআদিশূরনৃপতৌ বর্গে সমুজ্জৃম্ভতে
শ্রীমন্ বীরমহীপতে যদি ভবান্ যুদ্ধং ময়া সজ্জতে।
আগচ্ছ স্বয়মত্র সম্প্রতি তদা সামন্তসৈন্যান্বিতো
রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং নো মান্যমস্মাদৃশৈঃ ॥
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরং নৃপং নত্বা জ্ঞাপয়ামাস তাং ধ্রুবং ॥
শ্রুত্বা রোষবশাদশেষনৃপতিশ্রেণীসমভ্যর্চিতো
যোদ্ধাযোদ্ধুমলংচকার নৃপতিঃ শ্রীআদিশূরঃ স্বয়ং ॥
দৃষ্ট্বা তাবদমাত্যবিশ্ববিজয়ী প্রোবাচ বাচং বিভো
বিশ্রামং কুরু তে দ্বিজঃ নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যামহে ॥
শ্রুত্বামাত্যবচঃ সসজ্জিতমহাসৈন্যসঙ্গী প্রতস্থৌ
দূতস্তত্রাহ রাজন্ কুরু মম বচনাদদ্য বিশ্রামমত্র ॥
নেতব্যং হ্যমত্যাবং বলমিদমখিলং বীরসিংহদ্বিজেন্দ্রৈঃ
শূদ্রাগর্ভেষু জাতা নরবরভবতস্তত্র বিপ্রে পতঙ্গাঃ ॥
ততো দূতো রাজানমাহ।
তস্মাত্ত্বং দ্বিজবর্য্যমানয় ততো যুক্তির্ময়া দীয়তে
সন্ত্যেতে বৃষবাহনেন সহসা যুদ্ধায় জাতোদ্যমাঃ।
গত্বা তত্র সমাচরন্তু সহসা তদ্রাজ্যভঙ্গং কুরু তদা
ন দ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোব্রাহ্মণানাং বধঃ ॥
ততো রাজা আদিশূরো নিজদেশস্থনিরগ্নিক ব্রাহ্মণান আহূয় আজ্ঞাপয়ামাস।
যূয়ং গবারোহণেন শস্ত্রবন্তঃ বীরসিংহপুরে গত্বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণান আনয়ত। যদি স রাজা সহজে ন ব্রাহ্মণান্ দদ্যাৎ তদা তদ্রাজ্যনাশং ভবদ্ভিঃ কার্য্যমিতি।
ততো বিপ্রা ঊচুঃ—
রাজংস্ত্বদ্বচনং ন বৈধবচনং বল্গাবারোহণং ত্বৎকর্ত্তুং
নৈব হি সম্মতা বয়মহো নো সিদ্ধশ্চেৎপীড়নং।
কর্ত্তায়ং যদি কর্ম্মধর্ম্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক্যাৎ
স্থানং তত্র ন চাত্র ভূসুরকুলে কর্ম্মণঃ কুত্র চ স্যাৎ ॥
আহ আদিশূরঃ—
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে সাগ্নিকা বিপ্রবর্য্যা
গোবাহাদিষু দোষতঃ খলু ময়া মোচিতাঃ সাধুকার্য্যাঃ।
যুষ্মৎকার্য্যবিধিঞ্চ তৈঃ সমমহং সজ্জারয়িষ্যে হিতং
যুষ্মৎসন্নিহিতে শ্রীবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতং ॥
ততো রাজবাক্যং শ্রুত্বা সপ্তশতপরিমিত ব্রাহ্মণা গবারোহণেন চেলুঃ রাজ্ঞ আজ্ঞয়া।

তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের কথা শুনিয়া কাশীরাজ মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং "দ্বিজ-বেদযজ্ঞরহিত তোমার রাজ্য আমার মত লোকের নিকট কখনই মান্য নহে" বলিয়া আদিশূরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আদিশূর যুদ্ধসজ্জার আদেশ প্রদান করিলে সেই দূত তাঁহাকে নিবেদন করিল—"আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে বৃষোপরি স্থাপন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করুন; গোব্রাহ্মণ দেখিয়া আর সেই রাজা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে।" তখন রাজা স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া তদনুযায়ী আদেশ করিলেন। গবারোহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করায় আদিশূর তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, তবে আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করিতেছি যে, সাধুকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে গোবাহন-জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" রাজার আশ্বাসবাক্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ গোবাহনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বীরসিংহপুরে গিয়া বীরসিংহের রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহ তখন পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। আদিশূরের মৃত্যুসময়ে সেই সপ্তশত নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের মধ্যে ২৮জন জীবিত ছিলেন।

আখ্যায়িকা উল্লেখের কারণ।

এত সহজে যদি কান্যকুব্জরাজ্য জয় করা যাইত, তবে তো ভাবনাই ছিল না। বীরসিংহের সহিত আদিশূরের এই যুদ্ধসম্বাদ এতই হাস্যকর যে, ইহা উল্লেখযোগ্যই নহে। আশ্চর্য্য এই যে, ধ্রুবানন্দমিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দমিশ্রও সম্ভবত বাচস্পতিমিশ্রের উক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহারও গ্রন্থে এই আখ্যায়িকাকে স্থান দিয়াছেন *। আমরা

পৃষ্ঠস্থলে বাণধনুর্দ্ধানাঃ বৃষাধিরূঢ়াঃ সমরে নিবিষ্টাঃ
দ্বিজাতয়ঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ শ্রীবীরসিংহস্য পুরে প্রবিষ্টাঃ।
ততস্তত্র তে গত্বা রাজ্যনাশং প্রচক্রু-
স্তদ্দৃষ্ট্বা বীরসিংহস্য দূতো বিজ্ঞাপয়ামাস নৃপং॥
বৃষারূঢ়াবিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতো রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ
দ্বিজং দত্বা হেভাস্তব ধরণীং মন্ত্রিণা চৈবমুক্তং।
সমাহূয় স্বীয়ং দ্বিজবরমসৌ ভূপতি-
স্তং বক্তাসে প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈর্দীয়তে তত্র বৃত্তিঃ॥
আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতোহি গৌড়ে
রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥

অতঃপরঞ্চাদিশূরো মমার। * * ততো দেশস্থ নিরগ্নিক সপ্তশত ব্রাহ্মণানাং মধ্যে অষ্টাবিংশতি দ্বিজাতয়ঃ সন্তি তেভ্যঃ সামগাগ্নিকায়াষ্টাবিংশতি বাসস্থানানি দদৌ॥ বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম—ব্রা০ কা০ ৮১-৮২ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃত অংশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না—আমি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি—লেখক।

* ততো লিপিং নরপতিঃ প্রেরয়ামাস সত্বরং।
কান্যকুব্জেশ্বরশ্রীমদ্ বীরসিংহনৃপান্তিকে॥ ১৮
* * *
মন্ত্রী দূতমুবাচেদং যূর্থস্তে নৃপতিঞ্চ বং।
পতিতো বঙ্গদেশস্থ ন শ্রুতঃ স ইতি কচিৎ॥ ২১
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি।
অতো বঙ্গাখ্যদেশেতু ন গমিষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ॥ ২২
* * *
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরান্তিকে দূতো হ্যানুপূর্ব্বমবর্ণয়ৎ॥ ৩৪
শ্রুত্বা রোষবশং গতো নরপতিঃ শ্রীআদিশূরস্ততো
যোদ্ধুন্ যোদ্ধুমরঃচকার সহসা হ্যাদেশমেব স্বয়ং।
তজ্জ্ঞাত্বা সচিবাগ্রণীর্নৃপবরং প্রোবাচ কিঞ্চিৎক্ষণং
বিপ্রমং কুরু ভো দ্বিজ নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যাম্যহং॥৩৫
গোবিপ্রপ্রতিপালকঃ স নৃপতির্ধর্ম্মাত্মনামগ্রণী
স্তস্মাৎ বিপ্রগণান্ স্বরাজ্যনিলয়ানানীয় সংপ্রেরয়।
যুদ্ধার্থং বৃষবাহনেন সহসা দৃষ্ট্বা দ্বিজান্ সৈনিকান্
গোবিপ্রক্ষয়শঙ্কয়া ন নৃপতির্যোদ্ধুং প্রবর্ত্তিষ্যতে॥ ৩৬
শ্রুত্বামাত্যবচস্ততো দ্বিজগণানাহূয় চোবাচ তান্
ধৃত্বা সৈনিকবেশমেব সমরে গোবাহনেনাধুনা।
যূয়ং গচ্ছত হে ধরামরগণাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশ্বরং
জিত্বা কৌশলতঃ সুসাধয়ত মে তূর্ণং মনস্কামনাং॥ ৩৭
ভূদেবা নৃপতের্নিশম্য বচনং প্রাহুর্নৃপং ধর্ম্মপং
বিপ্রাণাং বৃষবাহনেন গমনং নো বৈধকার্য্যং স্মৃতং।
তস্মাদনামুপায়মেব নৃপতে নিশ্চিত্য কার্য্যং কুরু
ভূপৈরগ্রজধর্ম্ম এব সততং সংরক্ষণীয়ো যতঃ॥ ৩৮
রাজোবাচ কৃতাঞ্জলির্দ্বিজবরান্ শ্রুত্বাতু তেষাংগির
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে পৃথ্বীশ্বরাঃ সাগ্নিকাঃ।
গোবাহাৎ দ্বিজদোষতঃ খলুতদা সংমোচয়িষ্যেহপ্যহং
যুষ্মৎসন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতং॥ ৩৯
শ্রুত্বা নৃপস্যাভয়বাক্যমেতৎ বিপ্রাস্ততঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ।
গোবাহনা বাণধনুর্দ্ধানাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশপুরং যযুস্তে॥ ৪০
বেদাসুচ্চৈঃ প্রগায়ন্তো রণবেশধরা দ্বিজাঃ।
গোবাহনস্থা যুদ্ধায় সজ্জে তেঽতিসমুদ্যতাঃ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা তান্ সবিস্ময়ং প্রাহ কান্যকুব্জবলানি চ।
কিংকর্ত্তব্যং রণেঽস্মাভির্ভবতি চিন্তামুপাগমন্॥ ৪২
রণোদ্যমাৎ বিনির্বর্ত্ত্য গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
বীরসিংহান্তিকে সর্ব্বং কথয়ামাসুরদ্ভুতং॥ ৪৩
যুদ্ধে পরাজয়ঃ শ্রেয়ান্ ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
বিচিন্ত্যৈবং তদা রাজা রণাৎপ্রতিনিবর্ত্তিতঃ॥ ৪৪
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রেরণায় স ধর্ম্মবিৎ।
অঙ্গীকারং ততঃ কৃত্বা লিপিঞ্চ প্রদদৌ ধ্রুবং॥ ৪৫
সেনাপতিস্ততস্তূর্ণং সৈনাবেশধরৈর্দ্বিজৈঃ।
প্রত্যাগতঃ কান্যকুব্জাদাদিশূরস্য সন্নিধৌ॥ ৪৬
কথয়িত্বা যথাবৃত্তং দদৌ ভূপায় তল্লিপিং।
পঠিত্বা তাং লিপিং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ॥ ৪৭
ততঃ সপ্তশতান্ বিপ্রান্ গোবাহাদিজদোষতঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিবিধিনা মোচয়ামাস তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮
সৈন্যবেশধরা বিপ্রা যে সপ্তশতসংখ্যকাঃ।
তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি॥ ৪৯—কু-কং

আখ্যায়িকাটীর উল্লেখ করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, এখানে কান্যকুব্জেশ্বর বীরসিংহকে কাশীরও রাজা বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, কাশী ও কান্যকুব্জেরই মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে সম্ভবত কোলাঞ্চ বলা হইত। এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যখন আবার প্রবল হইতে লাগিল, সেই সময়ে সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যহীন * সাতশতী ব্রাহ্মণদিগকে † জনসাধারণের নিকট নিতান্ত উপহাসের পাত্ররূপে দাঁড় করাইবার জন্যই এই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের কিন্তু একটা কথা মনে হয় যে, সম্ভবত বীরসিংহের পরাজয়ে সাতশতী ব্রাহ্মণেরা কোন-না-কোন বিশেষভাবে আদিশূরকে সাহায্য করিয়াছিলেন; সেই ভিত্তির উপরেই ঐ উপহাস-উক্তি গ্রথিত হইয়াছে। নচেৎ যে কনৌজরাজের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকিত, তাঁহাকে কি না করায়ত্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অনভিজ্ঞ বৌদ্ধভাবে প্রবণ "অহিংসায রত" নিরীহ ৭০০ ব্রাহ্মণকে বৃষারোহণে প্রেরণ! আখ্যায়িকার ভিতর এতটুকু সত্য থাকিলে অথবা ইহার বিস্তৃত প্রচার থাকিলে প্রেমবিলাস সে সম্বন্ধে অন্তত একটুও উল্লেখ করিতেন—কিন্তু এবিষয়ে একটা কথাও উল্লেখ করেন নাই।

বল্লাল কর্ত্তৃক সাতশতী সৃষ্টি।

এড়ুমিশ্র বলেন—বল্লাল সেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দান লইতে অসম্মত হইলেন। বল্লাল তখন চণ্ডীর আরাধনা করিযা ব্রাহ্মণ করিবার অধিকার লাভ করিলেন এবং সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন ‡। এই আখ্যাযিকা হইতে আমাদের মনে হয়, কেবল সাতশতীদের অ-যাজ্ঞিকতা ও অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও অনুমান হয় যে, সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই বল্লালের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতশতীগণের সঙ্গে যখন "পুরা"কালীন রাজা অন্ধ্রকের যোগ কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তখন বল্লাল কর্ত্তৃক তাহাদের নূতন সৃষ্টি সম্ভব বোধ হয় না।

উড়িষ্যায় ইংরাজশাসন।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজগণ উড়িষ্যায় বাণিজ্যব্যপদেশে আসিয়াছিলেন। কটক জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর, বালেশ্বর ও পিপলীতে তাঁহাদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পিপলীবন্দরে কুঠী স্থাপন করেন, এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর সহরে তাঁহারা ব্যবসার কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। বালেশ্বর এক সময় ইউরোপীয়-দিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। দীনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ এই চারিটী প্রধান জাতির কুঠীর ভগ্নাবশেষ আজিও বালেশ্বরে দেখা যায়। সে সময় কুঠী-য়ালগণ প্রত্যেক কুঠীতেই সামান্য পরিমাণে সৈন্য রাখিতেন। বালেশ্বর ও পিপলী বন্দর হইতে বহু পরিমাণে মসলিন নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র রপ্তানি হইত। কেহ কেহ বলেন, কটক জেলার তন্তুবায়গণ যে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহাই বালেশ্বর ও পিপলীর ইউরোপীয় কুঠী-য়ালগণ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্যদেশে বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেন। উড়িষ্যার দক্ষিণে গঞ্জাম নামক স্থানে ইংরাজদের আর একটী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। সেই কেন্দ্র হইতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি হইত। তাহাকে ইউরোপীয়গণ 'জগন্নাথ' নামে অভি-হিত করিতেন। উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ বর্ত্তমান কালে

---

* বঙ্গেতে ভূদেব যত যজ্ঞাদি না ছিল জ্ঞাত
কারণ তাহার এই মাত্র।
বৌদ্ধেরা বুদ্ধিতে দড় কহে অহিংসাই বড়
হাঁ-ক্রিয়ায় ইনি কনাযাত্র ॥ ২
মুলো পঞ্চানন বচন—সং নিং ৩২৭ পৃ°

† সাতশতী দ্বিজ যারা আগে শূদ্রজাতিধারা
যেহেতু ব্রাহ্মণো ছিল যাম।
সারাবলীকারিকা (মুলো পঞ্চানন)—সং নিং ২৪৮ পৃ:

‡ কালে ভূরিতিথে গতে সমস্তবল্লালসেনো নৃপঃ সংপ্রত্যর্পণ লিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানযৎ স্বান্তিকং। দানাদানপরাংমুখাঃ ক্ষিতি পতেস্তে ব্রাহ্মণা যাজ্ঞিকাস্তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুধীঃ ॥ চণ্ডীমেব সমাররাধ সুচিরং ভূরিপ্রয়াসাদিভিঃ প্রত্যক্ষাৎজনি সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গা নিসর্গোজ্জ্বলা ॥ রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দাস্যাম্যহং সম্প্রত্যুত্তরতারতং দ্বিজগণান্ নির্ম্মাতুমিচ্ছামাহং। তুষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুখাচ্চৈবং . মহান্ কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়া জ্ঞাপিতং ॥ দত্তেমন্ত বরং নৃপায় সহসৈবান্তহিতা পার্ব্বতী রাজা সপ্তশতদ্বিজানতিগুণানাত্মাজ্ঞয়া নির্ম্মমে। তান্নির্ম্মায় নৃপ প্রসন্নহৃদয়ো দানানি[illegible]তেভ্যো দদৌ জাতঃ কৃৎস্নযতশ্চ কান্তিক-মনাঃ শৌর্য্যপ্রতাপোজ্জ্বলঃ ॥
এড়ুমিশ্রের কারিকা ব্রা° কা° ৭৯—৮০ পৃ°।

সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না বলিলেই হয়। দুই এক স্থানে এখনও যে সামান্য পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাও বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। কালক্রমে বালেশ্বর ও পিপলীর নদীর মুখ বন্ধ হইয়া এই দুইটী স্থানই ব্যবসার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বালেশ্বরে কুঠী স্থাপনের পর হুগলিতে ইংরাজগণ যে কুঠী স্থাপন করেন, সেই কুঠীর উন্নতির সহিত বালেশ্বর ও পিপলীর কুঠী ক্রমশঃ হতশ্রী হইয়া পড়ে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সে সময়ে উড়িষ্যা দেশ মারহাট্টাদিগের শাসনাধীন ছিল। মেদিনীপুর ও হুগলির কিয়দংশে উৎকলীয় ভাষার প্রচলন ছিল বলিয়াই এই প্রদেশকে মোগলগণ উড়িষ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন। ক্লাইভ দেওয়ানী সূত্রে এই অংশই পাইয়াছিলেন। সে সময় সুবর্ণরেখা নদী মোগল ও মারহাট্টা-শাসনাধীন উড়িষ্যার সীমা বলিয়া গণ্য হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় উত্তর বালেশ্বরের দুই-একটী পরগণার ও সমগ্র মেদিনীপুর জেলার চিরস্থায়ী রূপে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মারহাট্টাগণ গঞ্জামের লুণ্ঠন করিতেন বলিয়াই, লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য একটী অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযান গঞ্জাম হইতে অগ্রসর হইয়া পুরী ও কটক দখল করিয়াছিল। মারহাট্টাগণ বৃটিশ বাহিনীর গতি রোধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। পুরীর নিকট তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজসৈন্যের সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই সংঘর্ষকে যুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ইংরাজগণ মনে করিয়াছিলেন, মারহাট্টাগণ কটকের দুর্গে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলে ইংরাজদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। কারণ সে সময় যেরূপ কামান ও গোলাগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তদ্দ্বারা একটী সুরক্ষিত দুর্গ অবরোধ করা বহু ক্লেশসাধ্য ছিল; কিন্তু মারহাট্টাগণ কটকে যুদ্ধ না করিয়া নাগপুরাভিমুখে পলায়ন করেন। উড়িষ্যা দেশ দখল করিতে ইংরেজদিগের মাত্র ৩০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল; এবং সর্ব্ব সমেত পঞ্চাশ জন সৈনিক হত হইয়াছিল। এদেশের অধিবাসিগণ মারহাট্টাদিগের অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইয়া এরূপ বিরক্ত ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা মারহাট্টাদিগকে কোনও রূপ সাহায্য করে নাই বা বিজয়ী ইংরাজের গতিরোধ করিতে কোন প্রয়াস পায় নাই। পলাশীর যুদ্ধ যেরূপ বিনায়াসে ক্লাইব জয় করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও অনায়াসে ইংরাজগণ উড়িষ্যা বিজয় করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কেবল মুর্শিদাবাদ সহরের অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজের প্রতিকূলাচরণ করিলেই ক্লাইবের সামান্য সেনা ফুৎকারে উড়িয়া যাইত। এরূপ না করাই বাঙ্গালীগণের দুরপণেয় কলঙ্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীগণ ইংরাজের গতিরোধ করেন নাই, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। সিরাজদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ একজন বিচক্ষণ প্রজাপালক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা দুই কিম্বা আড়াই বৎসর মাত্র বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এমন কিছু করেন নাই যে, তদ্দ্বারা তিনি বঙ্গের সমগ্র প্রজামণ্ডলীর বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলা পলাসীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নরনারী স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হস্তোত্তলন করিলেন না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, বহু পূর্ব্ব হইতে বাংলাদেশের সমস্ত লোকই শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। স্বাধীনতার লেশমাত্র ধারণাও তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না। গ্রাম ও নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে প্রজাগণ বিজেতাকে রাজসম্মান প্রদান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। ইহাকে দাসমনোবৃত্তি বলা যাইতে পারে। উড়িষ্যার প্রজাগণ ইংরাজের গতিরোধ করেন নাই সত্য, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাভেদে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীর মত গুরুতর অপরাধী বলা যাইতে পারে না। মারহাট্টাদিগের অত্যাচারে উড়িষ্যাবাসীর দুর্দ্দশার চরম হইয়াছিল। তাঁহারা দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া দেশবাসীকে পশুভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। লোকে প্রাণের দায়ে পুত্র-কলত্রকে বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দাসব্যবসায়িগণ উড়িষ্যা হইতে ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া সুদূর সেন্টহেলেনা দ্বীপ পর্য্যন্ত পাঠাইত। জীবনের সুখ-সম্পত্তির আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেশ হইতে লোপ পাইয়াছিল। নিরন্ন প্রজাকুল গভীর অশান্তি ও মর্ম্মবেদনায় দিনাতিপাত করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় কোন লোকই বিজেতার গতিরোধ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না।

ইংরাজবিজয়ের সর্ব্বপ্রধান ফল—দেশে শান্তি ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উড়িষ্যার ভাগ্যে এরূপ শাসন ও শান্তি বহুদিন ঘটে নাই। ইংরাজগণ

ফৌজদারী বিভাগের সৃষ্টি করিয়া দুষ্টের দমন করিতে লাগিলেন। তস্কর ও ক্ষমতাপন্ন কিল্লাদারদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাকুলকে সতত‌ই রক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যাচার ও অবিচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রজাকুল ইংরাজশাসনের অনুরক্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা মহারাষ্ট্রশাসনের অত্যাচার-অবিচার দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইংরাজশাসনকে রাম-রাজত্ব বলিলেন।

ইংরাজশাসনের মত সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসন এদেশে বহুদিন ছিল না। বিদেশী বিজেতার পক্ষে যতদূর প্রজামণ্ডলীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিয়াছেন। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচার ও অবিচার সত্ত্বেও দেশীয় রাজাদিগের শাসন প্রজাগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক ছিল। ইংরাজশাসন-যন্ত্রের সহিত দেশীয় শাসন-যন্ত্রের তুলনা করিলে সকল বিষয়েই ইংরাজশাসনপদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইবে। তবে কি কারণে ইংরাজ-শাসন দেশীয় শাসনপদ্ধতির অপেক্ষা মঙ্গলজনক নহে, এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইংরাজশাসনের দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, কেবল শাসন-যন্ত্রচালনায় দেশের অতি সামান্যই ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে। এদেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে বিদেশীয় সভ্যতা ও বিজাতীয় ভাবের প্রচারে আমাদের যেরূপ গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, শুধু বিদেশীয় শাসনপ্রণালী দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, উপাসনা ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতিতে বিদেশীয় ভাব যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, সেই বিপ্লবের ফলে আমাদের মনোভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতগণ আজ-কাল প্রায় সকল বিষয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। সকলেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু অসার অনুকরণে তাঁহাদিগের মনোভাব এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতীয়তার স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। বিজাতীয় সভ্যতা—বিজাতীয় ভাব যতদিন প্রবল রহিবে, ততদিন জাতীয়তার মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ইংরাজশাসনের ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেরূপ বিজাতীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার প্রচলন হইয়াছে, উড়িষ্যায়ও সেইরূপ হইয়াছে; বরং বর্ত্তমান সময়ে অন্য প্রদেশের অনুপাতে এদেশে বিজাতীয় সভ্যতা এখনও ভাবরাজ্যে ততদূর আবিলতা ও আবর্জ্জনা আনে নাই। বিজাতীয় সভ্যতা ও বিজাতীয় ভাব ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু। হিন্দু বা মুসলমান রাজাদিগের কুশাসন অবিচার ও অরাজকতায় ভারতীয় জাতীয়তার যে অনিষ্ট হয় নাই, কেবল বিদেশীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার প্রচলনে তাহার অনেকগুণ বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার তিরোধানে দেশব্যাপী অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মমূলক ভারতীয় সভ্যতায় বিদেশীয় ভাব যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাহার অবসান না হইলে, দেশে জাতীয়তার ভিত্তি কখনও দৃঢ় হইবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ভারতশাসনের উদ্বৃত্ত আয় প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের রাজকোষে যায় না। প্রায় প্রতিবর্ষই যেরূপ আয় হইয়া থাকে, তাহার অনুপাতে কোন কোন বৎসর সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ম্মচারী ও ইংরাজ সৈনিকগণ তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন ও কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, আইন অনুসারে পেন্‌সন্ বা অবসরবৃত্তি ভোগ করেন। এইরূপ পারিশ্রমিক ও বৃত্তি উচ্চহারে হইলেও তাহা কোনক্রমে অন্যায়মূলক নহে। দেশে শান্তিস্থাপন করিয়া এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগ খুলিয়া ইংরাজশাসকগণ দেশের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক যথেষ্ট নহে। গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিলে সত্যই মনে হয় যে, ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মার্থেই দেশ শাসন করিতেছেন; এবং এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কেবল শাসনকার্য্যের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিলে রাজনৈতিক আন্দোলন একান্ত অসার বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষকে অধীনে রাখিয়া ইংলণ্ডের যে কি লাভ হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে আমদানী-রপ্তানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে।

ব্যবসায় দ্বারা ইংলণ্ডের পরোক্ষভাবে যেরূপ লাভ হইতেছে তাহার সীমা পরিসীমা নাই। বিলাতের কলকারখানার মালিক ও মজুরগণ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের অর্থেই পুষ্ট হইতেছে। যে অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াছে, তাহার মূলে যে ভারত-বিজয় ও ভারতশাসন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাগমের আশায় ইংরাজগণ এদেশে আসিয়াছিলেন। দেশ শাসন করিবার অভিসন্ধি সে সময় তাঁহাদিগের ছিল না। পরে ইংরাজ বণিকগণ দেখিলেন, রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভ না করিলে স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় করা যায় না। রাজনৈতিক বিপ্লবে ও শাসনকর্ত্তার খোষখেয়ালে তাঁহা-

দিগকে যেরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত তদ্দ্বারা এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। মোগলসাম্রাজ্যের অবসানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আত্মকলহ এবং জাতীয় অনৈক্য ও দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ ভারতবিজয় করিলেন। কিন্তু যে মূল নীতি লইয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ব্যবসা ও শাসন একসঙ্গে চলিতে লাগিল। শাসন অপেক্ষা ব্যবসাতেই কোম্পানী সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং শাসনকার্য্যকে ব্যবসায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে রাজ্যভার কোম্পানীর হস্ত হইতে অপসারিত হইল এবং কালক্রমে কোম্পানীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইল। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য যখন ইংলণ্ড প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন, তখন ইংলণ্ডের বণিককুল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদিগের নিকট অন্য কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন না। ইংলণ্ডের মহাসভায় শ্রমিকদিগের একটি দল আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা এখনও এরূপ হয় নাই যে, বণিকদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিজমত কোন গুরুতর বিষয়ে চালাইতে পারেন। এদেশের শাসনযন্ত্রের পশ্চাতে ইংলণ্ডের বণিককুল রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা এদেশের রাজপ্রতিনিধি বা বিলাতের 'সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের' পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। বণিককুলের শাসনে ও প্রতিযোগিতায় এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিবার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের বণিককুল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যাহাতে এরূপ প্রয়াস ব্যর্থ হয় তাহার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকেন। বণিককুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি ইংলণ্ডে কোন রাজনৈতিকদলের নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ বা তাহার কোন প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা ভারতগভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের বণিকগণ পরোক্ষভাবে দেশশাসন করিতেছেন বলিয়াই এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, প্রজাপুঞ্জের চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে; কিংবা তাঁহারা কোন দোষে দোষী নহেন। নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয়গণও সংঘবদ্ধভাবে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই; এবং শাসকসম্প্রদায়ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। যে কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংরাজশাসনসময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উড়িষ্যাদেশেও দেশীয় শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অনেক অবনতি হইয়াছে।

ইংরাজ-শাসনসময়ে যেরূপ দেশব্যাপী শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেরূপ শান্তি দেশীয় রাজাদিগের শাসনসময়ে কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ। অপরাধীর দণ্ডবিধান করিবার জন্য ফৌজদারী বিভাগ খোলা রহিয়াছে; বিষয়-সম্পত্তি লইয়া কলহবিবাদ উপস্থিত হইলে দেওয়ানী বিভাগ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে যে দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অপর দিকে এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। অশান্তি ও অরাজকতায় দেশবাসিগণও সতর্ক যুদ্ধব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে উৎকণ্ঠায় তাঁহাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইত, তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের হৃদয়ে সৈনিকসুলভ গুণনিচয় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ শান্তির সুশীতল ছায়ায় কোমলতা ও ভীরুতা তাঁহাদের বংশধরগণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বন আর সেরূপ দেখা যায় না। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সজীবতার—প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। একদল সশস্ত্র ডাকাতের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা দেশবাসীর নাই। সুশাসন ও সুগভীর শান্তির এরূপ বিষময় ফল কেন ফলিল? ইংরাজ আমলে দেশ এরূপ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিক অবসর আমাদের নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, যে শাসনশৃঙ্খলা ইংরাজগণ এদেশে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এদেশবাসিগণের কোন কৃতিত্ব নাই। শাসনযন্ত্রের নিম্নাঙ্গের অঙ্গস্বরূপ এদেশবাসিগণকে "রাজগণ নিযুক্ত করিয়াছেন" সত্য; কিন্তু মূল নীতি উদ্ভাবন, শাসনপরিচালন বা সুশৃঙ্খলা স্থাপনের মূলমন্ত্র ইংরাজের নিজস্ব। ইংরাজগণের পরিচালনা, পরামর্শ ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে শাসনকার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত কোনক্রমে চলিতে পারিত কি না বলা যায় না। এই শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদের;—এদেশবাসীর নয়। যে সকল বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয় বা পরাভব সাধন করিয়া তাঁহারা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এদেশবাসিগণ কোন দিন করিতে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। অপরের সুকৃতির ফলভোগ করিয়া কেহই বলবান ও

সুফকার হইতে পারে না। নৈতিক জগতেও এই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের মত সত্য ও অলঙ্ঘনীয়। ইংরাজের সুকৃতির ফলভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াই দেশবাসিগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে যদি দেশবাসিগণ মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ইংরাজের মত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সুশাসনের ফলভোগী হইয়া ইংরাজদিগের মতই শৌর্য্যবীর্য্যশালী ও প্রতাপান্বিত হইতে পারিতেন।

অন্নসমস্যা ও কৃষি।

"আগে অন্নবস্ত্র, তার পর স্বরাজ। কৃষিকাজই দেশের প্রকৃত কাজ—চাষকে আর চাষার কাজ বলে ঘৃণা করলে চল্‌বে না—ফিরে কর চাষ আর ফিরে ধর চরকা—এখন এই হচ্ছে আমার মন্ত্র।"

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

বাঙ্গালীর চাকরীর নেশা আজও ছুটলো না—দলে দলে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী আবেদন-পত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরচেন—

"কে নিবি গো কিনে আমায়
কে নিবি গো কিনে"

কিন্তু কেহই কিন্‌তে চায় না—চাকরীর সংখ্যা অল্প, আবেদনকারীর সংখ্যা অগণ্য; ফলে বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের জন্য যে সকল অর্থোপার্জ্জনের পথ আছে সেগুলিও একরূপ রুদ্ধ হয়ে এসেছে—মক্কেল অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা বেশী, ডাক্তার কবিরাজের যদি বা আবশ্যক থাকে তো পল্লীগ্রামে কেহই ব্যবসায় চালাইতে সম্মত হন না—সকলেই সহরে বসিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে চান—ফলে অনেককেই নিরাশ হতে হয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও অনেকস্থলে বাঙ্গালীর সততা ও একতা দেখা যায় না, সে জন্য অধিকাংশ যৌথ কারবারই টেঁকে না। এ সকল কারণে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যে অন্নসমস্যা বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে। এখন উপায় কি?

অনেকেই আজকাল কাগজে কলমে বলতে আরম্ভ করেছেন—কৃষিই বাংলার অন্নসমস্যা-মীমাংসার অন্যতর উপায়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, যাঁহারা এইরূপ পরামর্শ দেন, তাঁহারা অধিকাংশই চাকরীগতপ্রাণ—কৃষিকার্য্যে সাক্ষাৎভাবে কেহই লিপ্ত নন। এ বিষয়ে ইংরাজি প্রবাদবাক্য 'Example is better than precept' বা পরামর্শ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য অনেক বেশী, এই কথাটি আমাদের মনে পড়ে। যাঁরা কৃষিবিষয়ে দেশে বা বিদেশে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা যদি প্রত্যেকে চাকরীর অনুসন্ধান না করে একক ভাবে বা যৌথভাবে এক-একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং তাহা হইতে ভরণপোষণের উপযোগী যথেষ্ট আয় (Decent income) হচ্ছে দেখাতে পারেন, তাহলে দেশের যে কি মহৎ উপকার হয়, তা'বলে শেষ করা যায় না। তাহলে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ও কৃষিকে আর হেয়চক্ষে দেখবেন না এবং তাঁদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার লোকেরও অভাব হবে না। এ দেশে কৃষির উন্নতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের হস্তে—তাঁরা যদি এ বিষয়ে মনোযোগী না হন তাহলে কৃষির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আমাদের দেশের লোকের এমনই বুদ্ধিবিপর্য্যয় যে, তাঁরা কৃষির মত শান্তিপ্রদ, স্বাস্থ্যপ্রদ, স্বাধীন সংকর্ম্মকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; আর কুবাক্য, অপমান ও চোখরাঙানি সহ্য করে দাসত্ব করাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করেন—দাসভাব এমনই আমাদের মেরুমজ্জাগত হয়ে গেছে!

কৃষির প্রতি এই মিথ্যা অবজ্ঞা অপসারিত করতে হবে—বাংলাদেশকে পুনর্ব্বার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুলতে হবে। জগতে কোন কাজই হেয় নয়—আলস্যে বসে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাই যে সব চেয়ে লজ্জার বিষয়, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—সমস্ত লোকাপবাদ লোকলজ্জা তুচ্ছ করে কর্ম্মের বিস্তীর্ণ পথে চলতে হবে—এতেই শান্তি, এতেই তৃপ্তি, এতেই আনন্দ। উন্নত প্রণালীতে যাতে চাষ করা যেতে পারে, অল্প জমিতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে—জীবনযাত্রা যাতে সরল, সহজ ও বিলাসিতা প্রভৃতি বাহুল্য-বর্জ্জিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষির উন্নতি ও তজ্জাত দ্রব্যাদি নিয়ে বাণিজ্যশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের সদাশয় বড়লাট লর্ড আরউইনও এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন—দেশের কর্ম্মহীন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্য গ্রহণ করবার এই তো উপযুক্ত অবসর।

মহাত্মা গান্ধী যে সহরবাসীকে পল্লীতে ফিরবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, এসময় তার গভীর সার্থকতা আছে। পল্লীর উন্নতিসাধন করতেই হবে—কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা করতেই হবে—সহরের ভোগসুখ ও বিলাসিতা বর্জ্জন

করতেই হবে—প্রত্যেক বিষয়েই স্বরাট্ হতে হবে—নান্যঃ পন্থা।

আজ এই দারুণ অন্ন-সমস্যার দিনে তেজস্বী স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী দেশবাসীর প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করলাম :—

"তোরা কি করছিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত 'চাকরী দাও, চাকরী দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস্। জুতো খেয়ে খেয়ে দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস্? তোদের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এমন সুজলা সুফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধনধান্য প্রসব করচেন, সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে Civiligation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা? তোরা আবার তোদের বেদ-বেদান্তের বড়াই করিস্। যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ'। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই Raw matirial (পণ্যদ্রব্য) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্চে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস্! ...... আর তোদের দেশের জাতের বড়াই করে' করে' তোদের অন্ন পর্য্যন্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নাই—তারা আবার ইংরেজদের criticise (দোষ-গুণবিচার) কর্ত্তে যাস্—আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা-শিল্প-বিজ্ঞান, কর্ম্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছু নেই, কেবল Congress করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?"

আগ্নেয় গিরির গুপ্তরহস্য।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কথা—আধুনিক বিজ্ঞানের তখনও জন্মই হয় নাই,—ইটালী দেশস্থ বিসুবিয়স্ মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল এবং অবিরাম গিরিনিঃস্রাব বর্ষণ করিয়া সুদৃশ্য পম্পিয়াই নগরীকে সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। শৈশবে ভয়চকিত অন্তরে ঐ নগরাধিবাসিদিগের দুর্দ্দশার শোচনীয় বর্ণনা পাঠ* করিয়া ব্যথিত হইতাম। প্রাচীন সভ্য জগতে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই উক্ত ভয়াবহ ব্যাপারের সংবাদ রাখিতেন; আর সম্প্রতি পৃথিবীর প্রান্ত-ভাগস্থিত হাওয়াই ও হোর্কাইডো দ্বীপের আগ্নেয় গিরিদ্বয়ের বিচিত্র অগ্নিবর্ষণের কথা সকলেই পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেছে। ইহা বিজ্ঞানেরই বাহাদুরী। বিজ্ঞান মানুষকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের প্রভুত্ব দান করিয়াছে, বহু দূর দেশের সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে আনয়ন করিয়া লোককে সাবধান হইবার যথেষ্ট অবকাশ দিতেছে, এবং আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে অন্যান্য বহু ব্যাপারের ন্যায় ভূগর্ভের বিচিত্র গুপ্ত রহস্যও প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান মনুষ্য-জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়া ফেলিবে।

পৃথিবীতে পর্ব্বতের অভাব নাই এবং উহাদের অস্তিত্ব কখনও যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। পর্ব্বতসমূহ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাই তাঁহারা পর্ব্বতের এক নাম রাখিয়াছিলেন ধরাধর। কিন্তু অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের ন্যায় উহাদের কোন্‌টী যে কখন মাথানাড়া দিয়া উঠিবেন, সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তাঁহার রাগ দূর হইতে পারে, কিন্তু পর্ব্বতের রাগ দূর করিবে কে? শোনা যায়, বিন্ধ্য পর্ব্বত মাথা তুলিতে আরম্ভ করিলে পৌরাণিক ঋষি অগস্ত্য কৌশলে তাঁহার মাথা নোয়াইয়া দেন*; কিন্তু এযুগে অগস্ত্যের অভাব খুব বেশী, কাজেই রাগী পর্ব্বতগুলির পরিচয় এবং উহাদের রাগের পূর্ব্ব-লক্ষণগুলি জানিয়া সাবধান হওয়া ব্যতীত এযুগের

* এই পৌরাণিক ব্যাপারটী একটী সংগঠনকারী উদ্গীরণ বলিয়া মনে হয়। অগস্ত্য মুনির সম্ভবত এমন এক উচ্চতর বিজ্ঞান অধিগত ছিল, যাহা দ্বারা তিনি সেই উদ্গীরণকে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল বৈজ্ঞানিকগণ বিসুবিয়সেরও উদ্গীরণ নানা উপায়ে সংযত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লোকের আর অন্য উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু তপস্বীর মত অনেক আগ্নেয়গিরি এখনও পৃথিবীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাদের বাগ্নির শান্তভাব দেখিয়া সাধারণে উহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধে 'নির্ব্বাণপ্রাপ্ত' এই বিশেষণটী বসাইয়া দেয়; কিন্তু উহাদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ বিশেষণের বিশেষ কোন মূল্য নাই। মরিচাধরা একটী পুরাতন কামানকে যেমন অনায়াসেই কাজে লাগাইতে পারা যায়—তেমনই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয় গিরিগুলি অতি তুচ্ছ কারণেও সজীব হইয়া উঠিতে পারে।

পৃথিবীর আগ্নেয়-গিরিসঙ্কুল স্থানসমূহের মধ্যে জাপানকে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। বহুল আগ্নেয়গিরির অবস্থান হেতু সেখানে ভূমিকম্প একরূপ দৈনিক ব্যাপার বলিলেও চলে। এই দ্বীপের অন্যতর আগ্নেয়গিরি বান্দেসান পর্ব্বতটীকেও এই প্রকার নির্জীব, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, নিরীহ বলা হইত; কিন্তু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঐ সব উক্তির যে কোন মূল্যই নাই তাহা জানাইয়া দিয়াছিল।

জাপানের পরই পূর্ব্বগোলার্দ্ধের সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুন্দাপ্রণালীস্থিত ক্রাকাতোয়ার নাম করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক মহলে ক্রাকাতোয়ার নাম নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই কোন বৈজ্ঞানিকই ঐ দ্বীপটী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কখনও শুভাগমন করেন নাই। অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে সে যেন এরূপ অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়াই নিজের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইহার পর হইতে ক্রাকাতোয়াকে আগ্নেয়-পর্ব্বত-পরিষদের প্রধানতম আসনই প্রদত্ত হইয়াছে; কারণ ভূগর্ভস্থ দুইটী প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরিশ্রেণীর সংযোগস্থলে তাহার অবস্থান, তাই সে প্রচণ্ড আগ্নেয়-শক্তির আধার।

ইটালীদেশের বিসুবিয়াসের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইউরোপের পর্ব্বতমহলে আইসল্যাণ্ডের "হেকলা" এবং সিসিলির "এটনার" নাম আছে। স্কটল্যাণ্ডেও বহু আগ্নেয়গিরির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু উহাদের অনেককেই এখন নির্জীব বলা হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত বান্দেসান ও ক্রাকাতোয়ার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াতে নির্জীব বা নির্ব্বাপিত বিশেষণ-দুইটীর বল অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে আপাততঃ কোন আগ্নেয়গিরির সন্ধান পাওয়া যায় না; এই সম্পর্কে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের পৌরাণিক ব্যাপার ও জ্বালামুখীর গিরিগহ্বরে লেলিহান অগ্নিশিখা প্রভৃতির মূল অনুসন্ধেয়। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশস্থ কোন পর্ব্বতের পাদদেশেও অগ্নির সন্ধান মিলিয়াছে বলিয়া কাগজে পড়া গেল। মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির লক্ষণসমূহ বিচার করিলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

হাওয়াই দ্বীপটী আমেরিকার সন্নিকটে এবং হোক্কাইডো জাপানের সমীপবর্ত্তী। ইহাদের উভয়েরই ব্যাপার অভিনব। কারণ পূর্ব্বে কখনও উহাদের নাম শুনা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে উক্ত পর্ব্বতসমূহের লক্ষণগুলির বিষয় আলোচনা করা যাক। আমাদের তর্কশাস্ত্র বলেন, "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ"। ইহার শাস্ত্রীয় প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় উক্ত বচনটী আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যদি কোন পর্ব্বত হইতে ধূম বা বাষ্প নির্গত হইতে দেখা যায়, তবে তাহা যে আগ্নেয়গিরি সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

আগ্নেয়পর্ব্বতের দ্বিতীয় লক্ষণ—গিরিনিঃস্রাব; উহা দেখিতে কতকটা শিলাজতুর ন্যায় এবং প্রথমাবস্থায় কর্দ্দমাকার—কিন্তু পরে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া যায়, অগ্ন্যুদগীরণ সময়ে উত্তপ্ত বায়ুনির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে উহা পর্ব্বতবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

উষ্ণজলের উৎসকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়; কারণ উষ্ণজলের অস্তিত্ব গিরিগর্ভে তপ্ত বাষ্পের অস্তিত্বের একটী হেতু। আমাদের দেশের সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথে প্রভৃতি স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণের অভাব নাই। বদরীকাশ্রমেও উষ্ণপ্রস্রবণের বিষয় শুনা যায়, সুতরাং এসকলের উপর একটু নজর রাখা ভাল। জাপানের বান্দেসান পর্ব্বতে উপরি-উক্ত তিনটী লক্ষণ দেখিয়াই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মিল্‌নে উহাকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক্, কি কারণে আগ্নেয় পর্ব্বত-গুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। আমাদের ধরিত্রী জননী যে এক সময় জগৎসবিতা সূর্য্যের অঙ্কগতা ছিলেন, ইহা এখন প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। ব্রাহ্মণের নিত্য উপাস্য গায়ত্রী মন্ত্রে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সুতরাং ইনিও যে এক সময়ে ঐ সূর্য্যসমপ্রভাই ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। ইঁহার সেই বংশগত তেজ ছাইঢাকা আগু-নের মত এখনও ইঁহার বিপুলাকার গর্ভকোষ-সকলের মধ্যে গলিতভাবে অবস্থান করিতেছে। ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় তরল পদার্থের সহিত সুশীতল জলেরও সংস্পর্শ ঘটিলে উহা বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। চঞ্চলতম পদার্থসমূহের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু হইতেছে অন্যতম—স্থির থাকা তাহার স্বভাবই নয়—ইচ্ছা তাহার বাহির হওয়া, সুতরাং কোন কোমল স্থান খুঁজিয়া পাইলেই সে বজ্রের ন্যায় শব্দে তাহাকে ফাটাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ Steam Enginএর Boilerএর কথা বলা যাইতে পারে। অধিক বায়ু সঞ্চিত হইলে যেরূপে Boiler ফাটিয়া যায়, ইহাও প্রায় সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে। আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের কারণ ইহাই।

আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে দুই প্রকার উদ্গী-রণের কথা শুনা যায়। একপ্রকার উদ্গীরণ ধীরে ধীরে পর্ব্বতটীকে সংগঠিত করে; অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ তরল গিরিনিস্রাবের দ্বারাই ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন হয়। গিরিনিস্রাব পর্ব্বতগাত্রে লাগিবামাত্রই কঠিন হইয়া যায়; এইরূপে স্তরের পর স্তর নির্ম্মিত হইয়া যখন পর্ব্বতটী একটী নির্দ্দিষ্ট আকারে উচ্চ হইয়া উঠে, তখন ভিত-রের শক্তি আর উহাকে ঠেলিয়া তুলিতে অক্ষম হইয়াই যেন গুহামুখটীকে আপনাপনি বন্ধ করিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ তুষারস্তূপ ও চুনের জলের ঝুরির নির্ম্মাণকথা বলা যাইতে পারে। দিনের পর দিন তুষার সঞ্চিত হইয়া যেরূপে একটী বরফ স্তূপে পরিণত হয় এবং চুনের জল গড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন ধরিয়া যেরূপ ঝুরি নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতে থাকে, এক্ষেত্রেও কতকটা সেইরূপ। অনন্তর বহু যুগ অতীত হইলে লোকে মনে করে পর্ব্বতটী নির্জীব, কিন্তু ভিত-রের আগুন একেবারে নিভিয়া যায় না—উহা বহু যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চার করিতে থাকে; তাহার পর কোন সুযোগ পাইলেই পর্ব্বতটীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহা যেন প্রাকৃতিক ছেলেখেলা! কত শীঘ্র ভাঙ্গা যায় ইহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই যেন বহু যুগ ধরিয়া তাহার এই গঠন কার্য্য চলিয়াছিল। এই ধ্বংস-বহুল বিস্ফোরণ-সমূহই দ্বিতীয় প্রকারের উদ্গী-রণ।

যে সলিলের স্পর্শে এই উদ্গীরণ-ব্যাপার সংঘটিত হয় সেই সলিল আসে কিরূপে, ইহাই এখন দেখা যাক। ঐ জল আসে নানা কারণে—প্রথমতঃ ভূস্তরের পুনর্গঠন কালে হ্রদের জল গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রজলের সহিত সংঘর্ষ ঘটিলে। শেষোক্ত কারণেই ভূগর্ভস্থ অগ্নির সহিত ভারতমহাসাগর ও চীনসমুদ্রের আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ-কালে ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণ হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ জল তো বাষ্পরূপে বিস্ফোরণ সঙ্ঘটন করে, কিন্তু ভিতরের অগ্নিময় তরল পদার্থটীর কি অবস্থা হয়? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তরল পদার্থটীই উক্ত বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে গিরিনিস্রাব বা তপ্ত কর্দ্দম আকারে বহির্গত হইয়া বহু গ্রামকে সমাধিস্থ করিয়া ফেলে এবং বহু নদীকেও গ্রাস করিয়া লয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জাপানের আসামা-গিরিনিস্রাবের বিষয় বলা যাইতে পারে; উহা গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া দুইটী সাধারণ নদীকে শুষিয়া লইয়াছিল এবং তাহার পর তাহাদের আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই।

অনন্তর বিস্ফোরণ ব্যাপারের একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিস্ফোরণ সময়ে গুহামুখ হইতে প্রথমতঃ ধূলিপূর্ণ বাষ্পরাশি বাহির হইতে থাকে। উহা এরূপ ভাবে গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, দূর হইতে উহাকে দুরারোহ পর্ব্বতপ্রাকারের ন্যায় বোধ হয়। উহার উপরিভাগে লেলিহান সর্পাকৃতি অগ্নিশিখাসমূহ ক্রীড়া করিয়া উহার ভীষণতাকে শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া তোলে। বজ্র-ধ্বনির তুল্য অবিরাম প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐ ধূম পর্ব্বতমুখ হইতে বহির্গত হয়, তখন আর-ব্যোপন্যাসের সেই কলসী মধ্যস্থ দৈত্যের কথা আপনাপনিই মনে উদিত হয়। ভীষণ গর্জ্জন, অবিরাম শিলা ধূলি ও কর্দ্দম বৃষ্টি এবং অগ্নির বিচিত্র খেলার নিকট পৃথিবীর সমূহ শক্তির সমবেত গোলা বর্ষণকেও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় এবং প্রলয়কালের একটী অস্পষ্টচিত্র কল্পনালোকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। এক কথায় ইহাকে 'খণ্ড প্রলয়' বলিতে পারা যায়। এই প্রলয় এবং উহার ভয়াবহ উপকরণগুলিই লোকসমাজকে জানাইয়া দেয় যে, কি দানবীয় মহাশক্তি ধরিত্রী দেবীর গর্ভে গোপনভাবে অবস্থান করিতেছে।

বিবাহ-মঙ্গল।

ইমনকল্যাণ—একতালা।

এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্
বিধির বিধানে মিলিল দুজনে
বিধির চরণে রো'ক্।
এ মিলনে খুসী আকাশের তারা
নীলাকাশ হতে দিক্ জ্যোতিধারা
কাননের পাখী ওষধি ও শাখী
প্রেমের বারতা বো'ক্।
এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্॥

এ মিলন অমল হোক্
এ মিলন অমর হোক্
এ মিলন প্রেমজ্যোতিতে
নিয়ত উজল রো'ক্।
এ মিলন ঝড়ে ঝঞ্চায়
যেন উজ্জ্বলতম তায়
প্রেমরবি হতে পায়
উছল অমৃতালোক।
এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

২´ ৩ ০ ১ ২´
পা II { পা পা পা। পা পা পা। ধঙ্ক্ষা -া -া। -গাঃ -মঃ গা I গা গা গা।
এ মি ল ন সু খে র হো০ ০ ০ ০ ক্ এ মি ল ন

৩ ০ ১ ১ ॥ ২´
। রা গা রা। সা -া -া। (-া পা পা)} I -া -া -া I সা সা -রা।
ম ধু র হো ০ ০ ০ ক্ এ ০ ০ ০ বি ধি র্

৩ ০ ১ ২´ ৩
। রা রা গা। সা রগা গা। গা গা গা I সগা গা গা। রা গা রা।
বি ধা নে মি লি০ ল দু জ নে বি ধি র চ র ণে

০ ১
। সা -া -া। -া পা পা II
রো ০ ০ ০ ক্ 'এ'

২´ ৩ ০ ১ ২´
II গা গা পা। পা পা ধা। প্া র্সা র্সা। -া র্সা র্সা I র্সা র্রা র্রা।
এ মি ল নে খু সী আ কা শে র্ তা রা নী লা কা

৩ ০ ১ ২´ ৩
। -া র্রা র্রর্সা। র্গা র্রা র্গা। র্রা র্সা র্সা I না না না। -া না নধা।
শ হ তে০ দি ক্ জ্যো তি ধা রা কা ন নে র্ পা খী০

০ ১ ২´ ৩ ০
। ধা না ধা। ধা পা পা I রা গা গা। রা গা রা। সা -া -া।
ও ষ ধি ও শা খী প্রে মে র বা র তা বো ০ ০

১
। -া পা পা II
০ ক্ 'এ'

২´ ৩ ০ ১ ২´
{ সা I । সা সা সা । সা ন্‌রা রা । রা -া া । -া -া রা I রা রা গা ।
এ মি ল ন অ ম॰ ল হো॰ ॰ ॰ ॰ ক্‌ এ মি ল ন

৩ ০ ১ ২´ ৩
। সা রগা গা । গা -া -া । -া -া } পা I পা পা পা । পা পা পা ।
অ ম॰ র হো ॰ ॰ ॰ ক্‌ এ মি ল ন প্রে ম জ্যো

০ ১ ২´ ৩ ০
। পা ধর্ম্মা -া । -া -গাঃ -মঃ I মগা গা গরা । মগা রা রা । সা -া া ।
তি তে॰ ॰ ॰ ॰ ॰ নি র্ম ল উ জ্জ ল রো ॰ ॰

১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া -া I গা গা পা । পা পা ধা । পধা -নর্সা র্সা । -া র্সা র্সা I
॰ ॰ ক্‌ এ মি ল ন ঝ ড়ে ঝ॰ ॰ ন্‌ ঝা র যে ন

২´ ৩ ০ ১ ২´
I র্সনা -র্রা র্রা । র্রা র্রা র্গা । র্গা -া -া । -া -া -া I র্সা র্গা র্গা ।
উ॰ ॰ জ্জ ল ত ম ভায় ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ প্রে ম র

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্গা র্রা র্রা । র্সা -া -া । -া -া -া I মগা গা গা । রা গা রা ।
বি হ তে পায় ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ উ চ্ছ ল অ মৃ তা

০ ১
। সা -া -া । -া -পা পা II II
লো ॰ ॰ ॰ ক্‌ 'এ'

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

নম্বী এই প্রকারে রামানুজকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু রামানুজ নম্বীর অসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠতা দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ্য-পথ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "জাতিগত প্রতিবন্ধক থাকিলেও আপনার প্রতি আমার যে অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে তাহা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা আমাকে অভীষ্ট পথ হইতে সহজে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি নম্বীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

সমস্ত রাত্রি কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি নম্বীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্রকে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন না। এমন কি, তাঁহাদের বাটীতে বসিয়া কোন শূদ্রকে আহার করিতে দেন না। যাহা হউক নম্বী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে শীঘ্র পূজাদি সমাপন করিয়া নম্বীর ভবনে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে নম্বী অপর পথ দিয়া রামানুজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে আহার্য্য দ্রব্যসকল প্রদান করিতে বলিলেন। রামানুজ-পত্নী তাহাই করিলেন। নম্বী অতি শীঘ্র ভোজন সমাপন

করিয়া মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। রামানুজপত্নী একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নম্বীর উচ্ছিষ্ট-পত্র ফেলিয়া দিয়া এবং উচ্ছিষ্ট স্থানে গোময় লেপন করিয়া, দ্বিতীয় বার স্নান করতঃ গৃহে আসিতেছেন, এমন সময় রামানুজ আসিয়া সকল কথা অবগত হইলেন।

যদিও নম্বী রামানুজকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু রামানুজ ভাবিয়াছিলেন যে কোন প্রকারে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া গৌণ শিষ্যরূপে পরিণত হইবেন। অনেকের বিশ্বাস যে কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে উক্ত ব্যক্তির তেজের কিঞ্চিৎ লাঘব করা হয়। এই জন্য অনেক শূদ্র গুরুর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

রামানুজ এবারে স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি জন্যই বা দ্বিতীয় বার স্নান করিলে, কেনই বা উচ্ছিষ্ট পত্র কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ফেলিয়া দিলে এবং কেনই বা উচ্ছিষ্ট-ক্ষেত্রে গোময় লেপন করিলে?" রামানুজপত্নী বলিলেন, "নম্বী নীচজাতীয় শূদ্র; তাহার উচ্ছিষ্ট অতি অপবিত্র, সুতরাং আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছি।" রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"নম্বীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র! রে হতভাগিনী, তুমি ঐ উচ্ছিষ্টের মূল্য জান না। আমি যাহাকে নিজের বাটীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, তিনি তোমার ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত। তুমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জান না। তুমি জান না, তুমি আমাকে কি অমৃত হইতে বঞ্চিত করিলে। নিশ্চয়ই তোমাকে এই-বার একদিন পিতৃভবনে গমন করিতে হইবে।"

এইরূপে স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিয়া রামানুজ নম্বীকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। তৎপরে নম্বীর নিকট পৌঁছিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আমার মনে কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে। আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক বরদ-রাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কি না?"

কথিত আছে যে, পরদিবস যখন নম্বী বরদরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, বরদদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয় নম্বী, আমার অনুমান হইতেছে যে তুমি আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" নম্বী বলিলেন, "হাঁ দেব, ইহা সত্য। রামানুজ আজ আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহার মনে যে অভিলাষ আছে তাহা পূর্ণ হইবে কি না? তিনি অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।" বরদরাজ বলিলেন, "সত্যই এইরূপ? এই যুবক অতি ভাগ্যবান। তাঁহার পক্ষে কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় ক্রিয়া মাত্র। আমিও ঐরূপ সন্দীপন মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্ন কি তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, তবে আমি তোমাকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা তুমি রামানুজকে গিয়া বলিবে। (১) আমিই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম। (২) আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম বিভিন্নতাই সত্যধর্ম্মপ্রতিপাদক। (৩) আমাতে আত্ম-সমর্পণ করাই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। (৪) জীবনান্ত সময়ে আমাকে একান্ত মনে চিন্তা করারও আবশ্যক নাই। (৫) আমাতে আত্মনির্ভরকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমার নিকট অবস্থান করেন। (৬) প্রশ্নকারীর তাঁহার গুরু মহাপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

পরদিবস প্রাতে নম্বী এই সকল কথা রামানুজকে অবগত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল বিষয়ই কি তোমার প্রশ্নের উত্তর? আমি আশা করি তুমি ঠিক ঠিক উত্তর পাইয়াছ।" রামানুজ বলিলেন, "যখন স্বয়ং বরদ-রাজ এই সকল উত্তর দিয়াছেন, তখন কি তাহা আমার প্রশ্নের অনুরূপ না হইতে পারে?" নম্বী বলিলেন, "রামা-নুজ! তুমিই ধন্য। তোমার দ্বারাই ভগবানের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।"

এদিকে একদিবস যমুনাচার্য্যের শিষ্যগণ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! আপনি কি বলিতে পারেন কোন্ মহাপুরুষ ভবিষ্যতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবেন?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তোমরা কি গুরুদেবের মৃত্যুদিনের সেই আশ্চর্য্য ঘটনা ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ? গুরুদেব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যাহাকে স্বস্থানে বরণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রামানুজ ভিন্ন আর কে তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইতে পারে?" শিষ্যগণ বলিলেন, "তবে আপনি কাঞ্চীনগরে গমন করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ গুরুদেবকে আনয়ন করুন।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

ইত্যবসরে রামানুজ ও বরদরাজও কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি বর্ত্তমান চিংগলীপেট জেলায় মদুরান্তকম নামক স্থানে তথাক পালক নামক দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্রই মহাপূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ তখন মহাপূর্ণের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় আনন্দা-শ্রুতে ধৌত করিলেন এবং তাঁহার নিকট কাঞ্চীখণ্ডের প্রশ্নোত্তর কথা ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে রামানুজ বলি-

লেন—"মহাভাগ, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিন।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? কাঞ্চীতে প্রত্যাগমন করিয়া যে দেবতা আজ আমাদের উভয়কে একত্র করিয়াছেন তাঁহার সম্মুখে তোমাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিব।" রামানুজ বলিলেন, "বিলম্বের কথা কি বলিতেছেন? আপনি জানেন, যখন আমি গুরুদেব যমুনাচার্য্যের নিকট শিক্ষার জন্য গিয়াছিলাম, তখন কি ঘটিয়াছিল। আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহপিঞ্জরের মধ্যে বাস করা এতই স্থির নিশ্চিত কি, যে আমরা কাঞ্চী-প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি?" মহাপূর্ণ স্বগত বলিলেন, "কি প্রবল ধর্ম্মপিপাসা!"

তৎপরে মহাপূর্ণ রামানুজকে নিকটবর্ত্তী এক বকুল-বৃক্ষের তলে লইয়া গিয়া তাঁহার কপোলদেশে বৈষ্ণবী রেখা তিলকাদি অঙ্কিত করিয়া দিয়া দেবসেবাব্রতে ব্রতী করাইলেন।

তৎপরে মহাপূর্ণ রামানুজকে তাঁহার দক্ষিণ দিকে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত এবং বক্ষস্থলে বাম হস্ত রাখিয়া তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং ভগবানের নাম গ্রহণপূর্ব্বক যমুনাচার্য্য-প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে বিশিষ্টাদ্বৈত মতে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনার্থ ভগবান রামচন্দ্র পিতার অভিলাষ মত সিংহাসন গ্রহণ করিতে না পারায় যেমন ভরতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বীয় চিহ্নস্বরূপ পাদুকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের গুরুদেব যমুনাচার্য্যও তেমনই তোমাকে স্বহস্তে দীক্ষিত করিবার অবসর না পাইয়া আমাকে তোমার দীক্ষার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এমতে তুমি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে—আমার নিকট হইতে নহে।"

রামানুজ বলিলেন, "প্রভু! আপনি কি আমাকে বলিয়া দিবেন, জীবনে কি উদ্দেশ্য সাধনা করা কর্ত্তব্য? কি উপায়েই বা ইহাতে সফলকাম হইতে পারা যায়? এবং কেই বা সেই উদ্দিষ্ট দেবতা?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "ভগবান বরদরাজই সেই উদ্দিষ্ট দেবতা। আমি যে তোমাকে দ্বিসত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, সেই মন্ত্র সাধনার দ্বারাই উহাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর তিনিই আমাদের গন্তব্য স্থান। এক্ষণে মৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া উক্ত গন্তব্যপথে অগ্রসর হও।"

পরদিবস প্রাতে উভয়ে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাপূর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বরদরাজের পূজা করিলেন।

অতঃপর রামানুজ মহাপূর্ণকে স্বীয় আলয়ে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ ইহাতে সম্মত হইলেন। রামানুজের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বড় সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণগণ মহাপূর্ণের স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে বাড়ীতে আসিতে দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রামের মধ্যেও আসিতে দেয় না। কোন শূদ্র তাহাদিগের বাড়ীতে বসিয়া আহার করিতেও পায় না। ব্রাহ্মণেরা আহার করিবার সময় যদি কোন শূদ্র তথায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ অন্ন ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, মহাপূর্ণ রামানুজের বাড়ীতে থাকিয়া তিন মাস কাল তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে রামানুজের স্ত্রীও মহাপূর্ণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া মহাপূর্ণের পাদোদক সেবন করিলেন।

কিছুদিন পরে একজন বৈষ্ণব সাধু রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রামানুজ দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি ক্ষুৎপিপাসার অতিশয় কাতর এবং এতাদৃশ দুর্ব্বল যে তাহার অধিকক্ষণ দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। রামানুজ তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, এই বৈষ্ণব অনাহারে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। শীঘ্র ইহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান কর।" রামানুজপত্নী উত্তর করিলেন—"এখনও রন্ধন হয় নাই।" রামানুজ বলিলেন, "তবে কল্যকার অন্নের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাই শীঘ্র আনিয়া দাও।" পত্নী বলিলেন "তাহা হইতেও কিছু দিবার নাই।" রামানুজ তাঁহার স্ত্রীকে ভালরূপই জানিতেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় পূর্ব্বদিনের প্রচুর অন্নব্যঞ্জনাদি রহিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"এই তুমি দ্বিতীয়বার ভগবানের ভক্তের প্রতি অসদাচরণ করিলে। এই বৈষ্ণবকে ক্ষুধায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় দেখিয়াও তাহাকে এক মুষ্টি অন্নদানেও অস্বীকৃত হইলে এবং আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে। আমি কি কঠিনহৃদয় নারীকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি! সাবধান, পুনরায় এরূপ করিও না।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন রামানুজপত্নী মহাপূর্ণের পত্নীর সহিত কোন কূপ হইতে একত্র জল তুলিবার সময় মহাপূর্ণপত্নীর কলসস্থ জলবিন্দু রামানুজপত্নীর গাত্রে পতিত হয়। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপূর্ণপত্নীকে নীচজাতি বলিয়া গালি দেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কথা মহাপূর্ণের